দাম : বারো টাকা

পশ্চিমবঙ্গে বিধানপরিষদের পরিকল্পনা গরিবের ঘোড়ারোগের মতো
—পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে নিউইয়র্ক টাইমসের নতুন ছক
— পৃঃ ১৩

৭৩ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ২ আগস্ট, ২০২১ ।। ১৬ শ্রাবণ - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

শপিং মল খোলা, স্কুল-কলেজ বন্ধ
পড়ুয়ারা বিভ্রান্ত, অভিভাবকরা দিশাহারা
সবার মনে একটাই প্রশ্ন—

কবে খুলবে রাজ্যের স্কুল-কলেজ

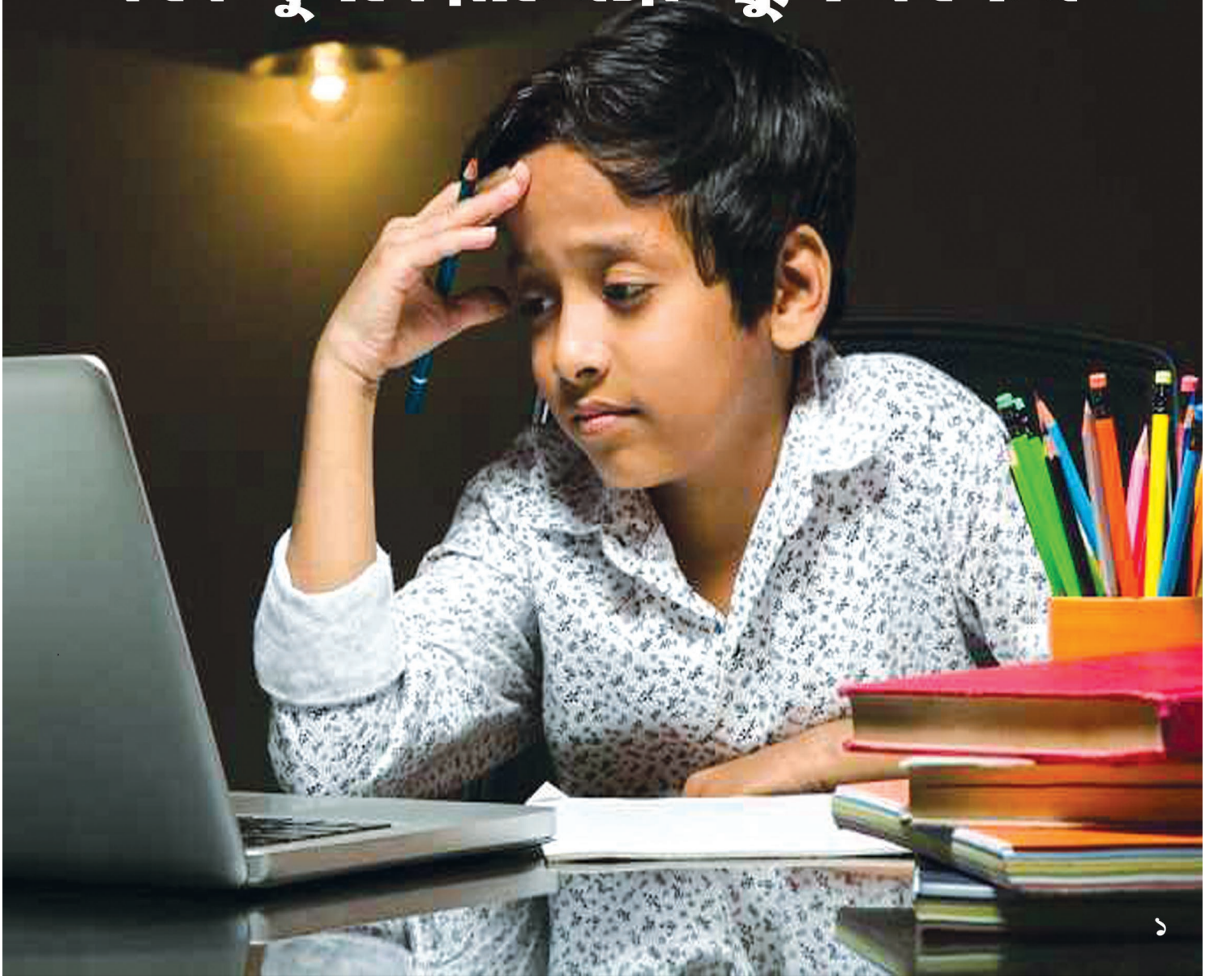

DURO™

60 years of quality and innovation. For generations of happy customers

LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION

LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY

TRIPLE HEAT TREATED

Duroply Industries Limited

BLOCK BOARD · PLYWOOD · VENEERS · DOORS

Toll Free: 1800-345-3876 (DURO) | **Website:** www.duroply.in

E-Mail: corp@duroply.com | **Find us on:**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২ আগস্ট - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

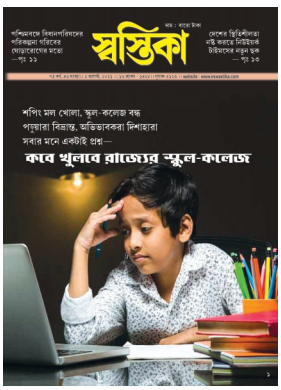

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পদকীয় ◻ ৫

জেসুইট ধর্মযাজকের মৃত্যুর থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ৬

মুসলিম প্রথমা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে না
রাজীব তুলি ◻ ৮

ভ্যাকসিনেশন প্রসার ও উদীয়মান ভারতীয় অর্থনীতি
◻ পায়েল চ্যাটার্জি ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদের পরিকল্পনা গরিবের ঘোড়ারোগের মতো ◻ অমিত দাশ ◻ ১১

দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে নিউইয়র্ক টাইমসের নতুন ছক
◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১৩

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়া বনাম রাষ্ট্র
◻ মৈনাক পূততুণ্ড ◻ ১৫

আল আমিন কেন স্কুল খোলে না ◻ সোমেশ্বর বড়াল ◻ ১৭

তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের গণহত্যার বত্রিশ বছর পূর্তি
◻ সৌমিত্র সেন ◻ ১৮

করোনা বিধিনিষেধের অস্ত্রে বিরোধীদের ঘায়েল করার উদ্দেশ্যেই কি রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি খোলার উদ্যোগ নেই?
◻ সাধান কুমার পাল ◻ ২৩

অতিমারীতে রাজ্যের শিক্ষা চলে গেল ভেন্টিলেটরে
◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ২৫

করোনা মহামারী শিক্ষা জগতেও থাবা বসিয়েছে
◻ অনামিকা দে ◻ ২৭

মহারাণা প্রতাপ ও হলদিঘাটের অবিস্মরণীয় সংগ্রাম
◻ ডাঃ আর এন দাস ◻ ৩১

বাঙ্গলায় মোদী বহিরাগত হলে গুজরাটে মমতা ব্যানার্জি কী?
◻ জাহ্নবী রায় ◻ ৩৩

'একটি সুন্দর বৃক্ষ' যেটি ইংরেজরা উপড়ে ফেলেছিল
◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গ এখন রাজনৈতিক পিশাচদের ডেরা
◻ অগ্নিশিখা নাথ ◻ ৩৮

ভরা শীতে অরুণাচলে ◻ বিজয় আঢ্য ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ খেলা : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ অন্যরকম : ৪২ ◻ স্মরণে : ৪৯ ◻

প্রকাশিত হবে
৯ আগস্ট
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৯ আগস্ট
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে বামপন্থীরা সংবিধানে উল্লেখিত নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিয়ে সবিশেষ মাথা ঘামিয়ে থাকেন। কিন্তু নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য নিয়ে তাদের বিশেষ মাথাব্যথা দেখা যায় না। অথচ মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক কর্তব্য সংবিধানের একই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। লিখবেন— সুজিত রায়, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তাস্য যশ প্রমুখ।

উল্লেখ্য— স্বস্তিকার আগামী সংখ্যাটি স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments From-

A
Well
Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দলিত কুসুম

সন্তানসন্ততি পরীক্ষায় ভালো ফল করিলে অভিভাবকেরা স্বভাবতই খুশি হইয়া থাকেন। কারণ পরীক্ষায় ভালো ফল ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। কিন্তু যখন কোনো পরীক্ষায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রকেই পাশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই ফলাফল কীসের ইঙ্গিত বহন করে? সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গণহারে পাশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার মূল্যায়ন না করিয়া এই ফলাফলের সার্থকতা কোথায়? ইহাতে কি যাহারা এই শিক্ষাবর্ষে সরকারি বদান্যতায় পাশ করিল তাহাদের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা পড়িল না? উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন এই ফলাফল সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিবে, ঠিক তেমনভাবে চাকুরিক্ষেত্রেও ইহার ফল হইবে ভয়াবহ।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ লইয়া ছিনিমিনি খেলা বাম জমানাতেই শুরু হইয়াছিল। তৃণমূল আমলে অধঃপতনের সেই গতি আরও ত্বরান্বিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, এমন তুঘলকি কাণ্ড আগে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। এই প্রসঙ্গে সরকার ও প্রশাসন অতিমারী উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতির সাফাই গাহিবে। ইহাই বলা হইবে, করোনার নিমিত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে ডাকিয়া আনিয়া পরীক্ষা লইবার মতো পরিস্থিতি ছিল না। তাহাতে সংক্রমণ আরও বাড়িয়া যাইত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণসংশয় হইত। এই কথা অনস্বীকার্য যে, এইসব যুক্তি অবহেলা করিবার মতো নহে। করোনার আবহে শারীরিক দূরত্ববিধি লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই ঝুঁকির ব্যাপার। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, তাহা হইলে দেশের অন্য কয়েকটি রাজ্য কী প্রকারে পরীক্ষা লইতেছে? সম্প্রতি কেরল ও উত্তরাখণ্ড সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করিয়াছে। এই দুইটি রাজ্যে সেপ্টেম্বর মাসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হইবে। পশ্চিমবঙ্গেও ছাত্র-ছাত্রীদের একশত শতাংশ পাশ না করাইয়া পরীক্ষা পিছাইয়া দেওয়া যাইতে পারিত। অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই সবের কিছুই না করিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জনমোহিনী নীতি গ্রহণ করিল। ইহাতে রাজনৈতিক সুবিধা হইল বটে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া উঠিল।

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি সত্যসত্যই অনন্যোপায় হইয়া এমন কাজ করিল? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তাহার দলের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস ঘাঁটিলে বোঝা যাইবে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বাতাসা দিয়া বিদায় করিবার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণতই পরিকল্পিত। রাজ্যে শিল্প নাই, চাকুরিও নাই। করোনা পরিস্থিতি এবং লকডাউনের বহু পূর্ব হইতেই অসংখ্য যুবক-যুবতী কর্মহীন। প্রশাসকের নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের দাবি, এই রূপ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের গণহারে পাশ করাইয়া তাহাদের কর্মপ্রার্থীর তালিকা হইতে দূরে রাখা হইল। স্কুল-কলেজগুলিতে স্থানাভাবের কারণে এই বৎসরের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই ভর্তি হইতে পারিবেন না। তাহা হইলে তাহারা কোথায় যাইবেন? মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী– কাহারও নিকট এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নাই।

ছাত্র-ছাত্রীদের জাতির ভবিষ্যৎ বলা হয়। তাহারা কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া দেশ ও বিশ্বকে সৌরভ প্রদান করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে সেই কুসুম দলিত। মুখ্যমন্ত্রী তাহাদের লইয়া রাজনীতি করিতেছেন। প্রশাসন তাহাদের লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে আগাইয়া যাইতেছে ধ্বংসস্তূপের দিকে।

সুভাষিতম্

জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্যতে ঘটঃ।
স হেতু সর্ববিদ্যানাং ধর্মস্য চ ধনস্য চ।।

বিন্দু বিন্দু জলে যেমন ঘট পূর্ণ হয়, সেভাবেই বিদ্যা, ধর্ম ও ধন সঞ্চয় করতে হয়।

জেসুইট ধর্মযাজকের মৃত্যুর থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ

বিশ্বামিত্র

এক রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক ফাদার স্ট্যানস্বামী অতি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। যে কোনো মৃত্যুই দুঃখের, তাই স্ট্যানস্বামীর মৃত্যুতেও আমরা শোক প্রকাশ করি। কিন্তু তাঁর মৃত্যু কতকগুলো প্রশ্ন রেখে গেল আমাদের সামনে। স্ট্যানস্বামীর মৃত্যুকে ঘিরে যে রাজনীতি হচ্ছে, তাতে দেশের প্রশাসনকে যেভাবে 'জল্লাদ', 'খুনি' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হচ্ছে, তাতে চেনা ছকের কৌশলটাই কিন্তু সামনে আসছে।

কী সেই চেনা ছক? সেটা হলো ইউএপিএ ধারাটিকে যেনতেন প্রকারে বাতিল করতে হবে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যাক, নানা পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের পর ১৯৬০-এর দশকে আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট (ইউএপিএ) গৃহীত হয়। মূলত দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য। আরও ভালোভবে বললে, বাকস্বাধীনতা ও দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সুযোগ নিয়ে কেউ যাতে দেশ বিরোধিতার চক্রান্তে লিপ্ত না হতে পারেন, তার প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবেই এই আইনের সূচনা। ২০০৪ সালে প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলে এই আইনের সংস্কার হওয়ার পর এর প্রায় সব ধারাগুলোই পোটায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইউপিএ গুরুত্ব হারায়। ২০০৮-এ মুম্বাই হামলার পর আবার ইউএপিএ-কে শক্তিশালী করার কথা ভাবনা-চিন্তা করা হয়।

স্ট্যানস্বামী ২০১৮-এর ভীমা কোরেগাঁও মামলায় ইউএপিএ আইনে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এনআইএ ২০২০ সালের ৮ নভেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেন, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতাও ছিল। আজ বিরোধীরা বলছে, গুরুতর অসুস্থতার জন্য স্বামী একাধিকবার জামিনের আবেদন করলেও আদালত তা নাকচ করেছে। কিন্তু একথা তারা একবারও বলছে না, এ বছরের ১৮ মে বোম্বে হাইকোর্টে স্বামীর গুরুতর অসুস্থতার কথা জানালে আদালত ২১ তারিখ ভিডিয়ো কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে শুনানিতে তাঁকে মুম্বাইয়ের জেজে হাসপাতাল বা অন্য কোনো বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে চাইলেও স্বামী অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের দাবিতে অনড় থাকেন। এর এক সপ্তাহ পরে বোম্বে হাইকোর্ট মহারাষ্ট্র সরকারকে একপ্রকার জোর করেই আদেশ দেয় তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তির জন্য তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতির কারণে। তারপরের ঘটনা সবার জানা।

এই ঘটনাকেই বিকৃত করে 'ভারতীয় বিচারব্যবস্থা খুনি', 'এখানে মানবাধিকার নেই' ইত্যাদি প্রচার চালানো হচ্ছে। মুশকিল হচ্ছে, ভারতীয় বিচারব্যবস্থা অভিযুক্তের প্রতি যথেষ্ট মানবিক, কিন্তু এই মানবিকতার সুযোগ নিয়ে একে কেউ দুর্বল ভেবে বসলে তা আমাদের সার্বভৌমত্বেই আঘাত। এটা আমাদের বুঝতে হবে। আসলে স্ট্যানস্বামীর মৃত্যু উপলক্ষ্য মাত্র। ছিদ্রান্বেষীরা যেন একপ্রকার প্রস্তুত হয়েই বসে রয়েছে, ভারতের বিচার ব্যবস্থা, ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বিশ্বশুদ্ধ লোকের সামনে হেনস্থা করতে। আর অবশ্যই এতে মদত জোগাচ্ছে এক শ্রেণীর কায়েমি বৈদেশিক স্বার্থ। খ্রিস্টান মিশনারিরা এদেশে ধর্মপ্রচারের নামে এদেশকে শুধু যে লুণ্ঠন করতে চায়, তাই নয়; ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য কায়েম করাই তাদের মূল লক্ষ্য। এই প্রবণতার শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যার বিরুদ্ধে কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। স্বাধীনোত্তর ভারতেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। খ্রিস্টান মিশনারিদের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আগ্রাসনের সাক্ষী হয়ে থাকছে আধুনিক ভারতও। কলকাতায় টেরিজার দৃষ্টান্তই তার জ্বাজল্যমান উদাহরণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার কাঠামো আজ আর নেই, এই কথাটা যেমন সত্য; ঠিক তেমনই এই কাঠামো অবলুপ্ত হলেও সেই বর্বর মানসিকতা, সারা পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের বাসনা ইউরোপ, আমেরিকার এখনও পূর্ণমাত্রায় বলবৎ। প্রাধানমন্ত্রীর 'আত্মনির্ভর ভারত' একদিকে যেমন দেশের মধ্যে দেশের স্বার্থ-বিরোধীদের মুশকিলে ফেলেছে, তেমনি অন্যদিকে দেশের বাইরে বৈদেশিক শক্তির সামনেই বড়ো চ্যালেঞ্জ খাড়া করেছে। সুতরাং অতীতে নানাভাবে যে প্রচেষ্টা বারবার হয়েছে যে ঐক্যবদ্ধ হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মণ্যবাদের জুজু দেখিয়ে বহুধাবিভক্ত করা এই খ্রিস্টান মিশনারিরা সেই কাজটাই করছেন সুচারুভাবে। হিন্দুসমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের অত্যাচারের গল্প শুনিয়ে তথাকথিত অন্ত্যজ বর্ণকে ধর্মান্তরিত করা চলছেই। আর এই কাজে স্ট্যানস্বামীরাই প্রধান নিয়ন্ত্রক। এই সত্যটাই সর্বাগ্রে স্বীকার্য। ফলে স্বামী বিবেকানন্দের বলা কথাগুলি, 'হিন্দুসমাজ থেকে একজন বাদ পড়লে শুধু যে হিন্দুসমাজ কমজোরি হয় তাই নয়, সমাজের একজন শত্রুরও বৃদ্ধি হয়'— আজ সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মোদী-শাহের জমানায় যে নতুন ভারত বিশ্বকে দিশা দেখাচ্ছে, সেখানে এই ষড় যন্ত্র একেবারেই কাম্য নয়। যদিও গত সাত বছরে নতুন ভারত তার কম সাক্ষী হয়নি। এবং স্ট্যানস্বামীর ঘটনাও যে এই বৃহৎ ষড়যন্ত্রেরই অংশবিশেষ তাও না বোঝার কোনো কারণ নেই। সুতরাং এক জেসুইট ধর্মযাজকের মৃত্যু যতই দুর্ভাগ্যজনক হোক না কেন, কোনো অপপ্রচারে প্রভাবিত হলে ভারতবাসীর চলবে না। দেশের স্বার্থের চেয়ে বড়ো আর কিছু হতে পারে না, রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই কথাটাই নব্য ভারতের শিক্ষা। □

মুসলিম প্রথমা

মাননীয় মহুয়া দাস
সভাপতি, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

রুমানা সুলতানা। নাম শুনেই তো বোঝা যাচ্ছে ওই মেয়েটির ধর্ম কী। ওকেই আপনি 'মুসলিম' বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। খুব ভালো করেছেন। আমি এতে কোনও অন্যায় দেখছি না। যদিও ওঁর ধর্ম রুমানার নাম ও পদবিতেই স্পষ্ট। তবু আপনি বলেছেন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের প্রধান হিসেবে আপনার উচ্চ বিচার থেকেই এটা করেছেন। বেশ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি নিজে সেটা বলতে পারলেন না। যেই না বিতর্ক শুরু হয়েছে, ওমনি আপনি দুঃখটুঃখ প্রকাশ করে নিয়েছেন। সেটাও বেশ করেছেন। কারণ, রুমানা তো নিজের কৃতিত্বে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে। পরীক্ষা নাই হোক কিন্তু যে যে ফলের বিচারে ও প্রথম সেখানে ওতো কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ও তো নিজের ধর্ম পরিচয় দিয়ে নম্বর চায়নি। তা হলে আপনি কেন বলতে গেলেন। ও তো চায়নি। তবে ওকে 'যে গোরু দুধ দেয়' সেই সম্প্রদায়ের বলে মনে করানোর দরকার ছিল না। এই রে আপনি আমার কথায় রাজনীতি দেখতে পাচ্ছেন বুঝি। হ্যাঁ, আমি রাজনীতির কথাই বলছি। তার আগে গোটা ঘটনাটা ছোট্ট করে বলে দিই ম্যাডাম।

রুমানা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম হয়েছেন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাস শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকেই। কিন্তু পাশাপাশিই শুরু হয় বিতর্ক। বিতর্ক এই নিয়ে যে, তাঁর ফলাফল নিয়ে বলতে গিয়ে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে। ছাত্রীর নাম রুমানা সুলতানা। শুক্রবার যিনি সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, 'মুসলিম না বললেই ভালো হতো। একজন ছাত্রী বললেই বেশি ভালো হতো। তবে আমি এটা নিয়ে কোনও বিতর্ক চাই না।' বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক না-করার জন্যও আবেদন জানিয়েছেন রুমানা।

কিন্তু তার আগেই আপনি বিতর্ক তৈরি করেছেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করতে গিয়ে আপনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের প্রধান মহুয়া দাস বলেছিলেন, 'সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে একটা ইতিহাস সংসদে হয়েছে। সেটা একটু বলতে ইচ্ছে করছে। যিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন একা।' এর পরেই আপনি বলেন, 'একক ভাবে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন এক মুসলিম কন্যা। মুসলিম...মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে একজন মুসলিম লেডি...গার্ল। তিনি একক ভাবে ৪৯৯ সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন।' সংসদের প্রধানকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর নামটি কি বলা যাবে। তিনি জবাবে বলেন, 'ওয়েবসাইট দেখে নেবেন।'

একবার নয়, তিনবার। 'মুসলিম' শব্দটি আপনি তিনবার বলেছেন। আপনাকে ডাক্তার দেখাতে হবে না। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, কেন আপনি এটা করেছেন। আসলে একটা 'অনুপ্রেরণা' আপনাকে এটা বলিয়েছে। তিনবার বলিয়েছে। যাঁর অনুপ্রেরণায় আপনি এই কথা বলেছেন, তিনি একটি ভোটে জিতে বলেছিলেন, গত লোকসভা ভোটে দলের ধাক্কা খাওয়ার মূল দায় ধর্মীয় মেরুকরণের উপরেই দিয়েছিলেন আপনার মাননীয়া দিদি। আপনার অনুপ্রেরণাদাত্রী দিদি এক ধাক্কায় ৩৪ থেকে ২২ নেমে গিয়ে বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িক ভোট আমি করি না।' আবার তারই পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগের জবাব দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তো তোষণ করি। হাজার বার করব! যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথিও ভালো!'

এইখানেই হচ্ছে সমস্যাটা। কদিন আগে রাজ্যে যে বিধনসভা নির্বাচন হয়ে গেল তাতেও উনি শতাংশের হিসেব দিয়েছেন। প্রকাশ্যে সদলে উনি বলেছেন, আমার ওই শতাংশটা নিশ্চিত। শীতলকুচির পরে ওঁরা বলেছেন, মুসলিমদের মারা হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কিছু বললে ওঁরা বলেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কথা বলা হচ্ছে। জঙ্গি, পাকিস্তান সব কিছুর বিরোধিতাই মুসলিম বিরোধিতা ধরে নেওয়া হয়। আর আপনারা ওঁর 'তাবেদার'রা সবসময় ওঁর অনুপ্রেরণার কথা বলেন। স্কুলপাঠ্য প্রতিটি সরকারি বইয়ের প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে অনুপ্রেরণার কথা। ২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যে যত শৌচালয় তৈরি হয়েছে তার বাইরের ফলকে লেখা রয়েছে অনুপ্রেরণার কথা। এই অসুখ থেকে আপনি বলে ফেলেছেন। অথবা আপনাকে বলতে বলা হয়েছে। বেশ করেছেন। প্রভুর কথা, মনিবের কথা শুনবেন না তো কার কথা শুনবেন। তাতে রুমানার মতো মেধাবী কন্যাকে অপমান করা হলেও বলবেন। অপেক্ষায় আছি। আমি একা নই, অনেকেই অপেক্ষায় আছেন। আপনি হয়তো নয়, অন্য কারও গলায় যেদিন শুনতে পাব, 'একক ভাবে সর্বোচ্চ জনসংখ্যায় এক মুসলিম রাজ্য। মুসলিম...সব জেলায় রেকর্ড গড়ে একজন মুসলিম লেডি...বাঙ্গলা।'

অতিথি কলম

রাজীব তুলি

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে না

ভারতবর্ষ কখনওই বৈচিত্র্যকে নিজের শত্রু হিসেবে গণ্য করেনি। সে কারণেই কোনো বিদেশিই দেশে থাকলে তার কাছে সেই অর্থে শত্রু নয়। কথাটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের আয়োজিত একটি পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহন ভাগবত এই বিষয়ে বিশদে বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্য তুমুল চর্চার বিষয় হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। তিনি ভাষণে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সূত্রে বলেছিলেন সমস্ত ভারতীয়ই হিন্দুস্থানবাসী ও সকলেই হিন্দু। ভাগবতের এই বক্তব্য সমসাময়িক রাজনীতিবিদদের যথেষ্ট অবাক করলেও কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হওয়া উচিত নয়।

ভেবে দেখুন, নির্বাচনের সময় এলেই সব পক্ষ থেকেই সংখ্যালঘুদের এক প্রকার ভয় দেখানো হয় যে সাবধান, বিজেপিকে হঠাতে হবে, সকলে আমাদের ভোট দাও। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বিজেপি ও আরএসএসের চরিত্রই হচ্ছে 'সংখ্যালঘু বিরোধী'— প্রচারের মাধ্যমে এমন একটা তকমাকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছে। তাদের একমুখী পরিকল্পনা বিজেপিকে ক্ষমতার অলিন্দে রাখা চলবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই সমবেত চিৎকারের মধ্যে সেই অর্থে সঠিক মুসলমান হতে পারে যে— তাদের বলতেই দেওয়া হয় না। মতামত ব্যক্ত করলে যদি তা সকলের শোনার পর বিশ্লেষণ করে অভিমত তৈরি করলে বিপদ হতে পারে তাই হয়তো অঙ্কুরেই তা দমন করা হয়।

শ্রীভাগবত এমন মতামত যে এই প্রথম দিলেন এমনটা কিন্তু নয়। এর আগে ২০১৮ সালে বিজ্ঞান ভবনে তিনি একগুচ্ছ বক্তৃতা দেন। তখনও তাঁর বক্তব্যে এই কথাই উঠে আসে। তখন তাঁর বক্তব্য ছিল হিন্দু জাতি সংক্রান্ত আলোচনা মুসলমানদের বাদ দিয়ে যা কখনওই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। মুসলমানদের ভূমিকা, অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা সেখানে থাকতেই হবে। এর অনেক আগে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক রাজেন্দ্র সিংহ (রাজ্জুভাইয়া) সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন 'ভারতভূমিতে বসবাসকারী সকল মানুষই হিন্দু। যে কোনো নাগরিক যদি এই ভারতবর্ষকে তার মাতৃভূমি বলে মনে করে এবং যাদের পূর্বপুরুষরাও ছিলেন হিন্দু এবং যারা এই ভারতের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভরকেন্দ্রে আস্থা রাখে ও সম্মান করে তারা অবশ্যই হিন্দু।' দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) তাঁর বক্তৃতাগুলিতে প্রায়ই উল্লেখ করতেন একটি চমৎকার কথা, 'যদি এই দেশে শৈব উপাসক হিন্দু থাকতে পারে, বৈষ্ণব অনুসারী হিন্দু বসবাস করতে পারে আবার একই আর্য সমাজের প্রথা আচারে বিশ্বাসী হিন্দু থাকতে পারে তাহলে মহম্মদিয়া বিশ্বাসী হিন্দু বা যিশু বিশ্বাসী হিন্দুই-বা থাকতে বাধা কোথায়?' পূজা-অর্চনা, প্রার্থনা পদ্ধতিতে পরিবর্তন কখনই জাতীয়তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারে না। এই ভিন্নতা জাতীয়তার ভিন্নতার সূচক নয়।

স্মরণে থাকবে পরাধীন ভারতে ১৯০৫ সালে ইংরেজ একটি দেশীয় রাজ্যকে ভাগ করে ধর্মের ভিত্তিতে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয় তার অভিঘাতে ১৯১১ সালে ইংরেজ অবার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনে। অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। কিন্তু আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজরা কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যায়।

ভারতের মুসলমান সমাজ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলমান সমাজের থেকে

> "দেশ গঠন ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সঙ্ঘ পরিচালনা থেকে শেষ স্বয়ংসেবকটির দায়বদ্ধতা সন্দেহাতীত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে কেবলমাত্র সংখ্যালঘু রাজনীতির নিরিখে বিচার না করে সঙ্ঘের নিজস্ব ও অন্যান্য ভিন্নমতাবলম্বীদেরও উচিত মূলধারার আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয় বিচারধারার সঙ্গী হয়ে এগিয়ে চলা। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে জাতির কল্যাণ।"

আলাদা। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সংগীত ও মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ। কিন্তু ভারতের মুসলমানরা নিয়মিত কাওয়ালি গান করে ও বিভিন্ন মাজারে গিয়ে নির্দিষ্ট অবয়বের সামনে প্রার্থনা জানায়। এই প্রথার উৎস কিন্তু হিন্দুত্ব। সাম্প্রতিক Pew Rescorch Centre-এর এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে ভারতে বসবাসকারী এক বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনগণ গঙ্গানদীকে পবিত্র বলে মানে। তারা একই সঙ্গে কর্মফলেও বিশ্বাস করে যা একান্তই হিন্দু বিশ্বাসের অনুষঙ্গ।

একই সঙ্গে একথাও অস্বীকারের কোনো উপায় নেই যে ভারতবর্ষের বিভাজন হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে। সেই সময় দেশের মুসলমান জনসংখ্যার গরিষ্ঠাংশই পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এর অন্যতম কারণ ছিল যে তৎকালীন হিন্দু সমাজ আদৌ সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ছিল না। আজকের হিন্দু সমাজের অবস্থা তখনকার থেকে অনেক আলাদা।

শ্রীভাগবত তার বর্তমান ভাষণে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ভারত চিরকালই হিন্দু জাতির আবাসভূমি। এটিকে নতুন করে হিন্দু রাষ্ট্রের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। এছাড়া খিলাফত আন্দোলনও পাকিস্তান জন্ম হওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নেয়। এরও অন্যতম কারণ হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ সংগঠনহীনতা। একই সঙ্গে তিনি এটাও বলেন ভারতে ইসলামের আগমন ঘটেছিল আক্রমণকারী বহিরাগতদের দ্বারা। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এই সূত্রে সাম্প্রতিক lynching বা পিটিয়ে মারার ক্ষেত্রে মুসলমান নেতৃবৃন্দের নীরবতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীভাগবত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও অতুলনীয় ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশি সমাজ নিবন্ধে যেভাবে লিখেছিলেন সঙ্ঘ সেই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই বরাবর কাজ করছে যা হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই ভারতের মূল ধর্ম। ভারত কখনওই বৈচিত্র্যকে তার শত্রু বলে ভাবেনি। একই সঙ্গে আগত বিদেশিদেরও সে শত্রু হিসেবে ধরেনি। নিজে যা অর্জন আছে তাকে অক্ষত রেখে অপরদিকে অন্য কাউকে ধ্বংস না করে আমাদের মূল ধর্মই হচ্ছে একটি বৃহত্তর ধাঁচার মধ্যে প্রত্যেককেই নিজস্ব জায়গা করে দেওয়া। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এই ভারতভূমিতে কেউই পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে একে অপরকে খুন করবে না। তারা এখানে একটি ঐক্যতান অনুভব করবে। এই ঐক্যতান বা একাত্মবোধ কিন্তু অহিন্দু হবে না বরং হবে একান্ত ভাবেই হিন্দু চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তাদের বাহ্যিক শরীর বিদেশির হতে পারে কিন্তু তাদের আত্মা হবে অবশ্যই ভারতীয়'।

রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যবান অবলোকন ও বিশ্লেষণটিকেই শ্রীভাগবত সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন। কোনো সম্প্রদায় যে কেবলমাত্র নির্বাচন কেন্দ্রিক দড়ি টানাটানির কেন্দ্রবিন্দু নয়, তারা যে দেশেরই অঙ্গ এটাই তিনি স্মরণ করিয়েছেন। কেবলমাত্র ভোটের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে তারা তো আলাদাই থেকে যাবে। এখানে বলা দরকার এক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়েরও ভূমিকা আছে তারা কিছু কট্টরবাদীর পরিচালনায় এতকাল মূলধারার শিক্ষা থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিত। এর পরিণতিতে তাদের শিক্ষায় আধুনিকতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার বদলে একপেশে ধর্মীয় কট্টরবাদিতার উন্মেষ হয়েছে। দেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি হয়েছে অনুদার।

আজকের ভারতীয় সমাজ একেবারে খোলাখুলিভাবে সরসঙ্ঘচালকের বক্তব্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারে। বিশেষ করে কারও কারও মতে এর মধ্যে বিতর্কের বীজ রয়েছে তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ সর্বদা কাম্য। কিন্তু দেশ গঠন ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সঙ্ঘ পরিচালনা থেকে শেষ স্বয়ংসেবকটির দায়বদ্ধতা কিন্তু সন্দেহাতীত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে কেবলমাত্র সংখ্যালঘু রাজনীতির নিরিখে বিচার না করে সঙ্ঘের নিজস্ব ও অন্যান্য ভিন্নমতাবলম্বীদেরও উচিত মূলধারার আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয় বিচারধারার সঙ্গী হয়ে এগিয়ে চলা। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে জাতির কল্যাণ।

(লেখক সঙ্ঘের দিল্লি প্রান্তের কার্যকারিণীর সদস্য)

ভ্যাকসিনেশন প্রসার এবং উদীয়মান ভারতীয় অর্থনীতি

পায়েল চ্যাটার্জি

স্বাস্থ্যই সম্পদ একথা অনস্বীকার্য। তাই জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতায় বলতে গেলে সুস্থ ব্যক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে আসা প্রাণঘাতী অসুখ নিরাময়ে ভ্যাকসিনেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

জনস্বার্থে ভারত সরকার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান শুরু করেছে ১৬ জানুয়ারি ২০২১, যা জনসাধারণের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে যে খুব তাড়াতাড়ি এই বিশ্বব্যাপী মহামারী নিয়ন্ত্রণে আসবে। এখন এটাই লক্ষণীয় যে এই বিপুল সংখ্যক ভ্যাকসিনেশন কীভাবে ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে এবং দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে।

গত বছরে (২০২০ সাল) সমগ্র বিশ্বব্যাপী লকডাউন অর্থনৈতিক গতিকে অনেকটাই স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমাদের দেশও এই অবস্থার বিপর্যস্ত। তাই বর্তমান সময়ে (২০২১) সমগ্রব্যাপী লকডাউন না হয়ে সময়ব্যাপী লকডাউন ভারতীয় অর্থনীতিকে অনেকটাই আশার আলো দেখাবে। এক্ষেত্রে কতগুলি বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে।

জনসাধারণের চাহিদা :

ভারতে কো-উইন অ্যাপের মাধ্যমে বৃহদাকারে কো-ভ্যাকসিন এবং কোভিশিল্ড প্রদান করা হচ্ছে যা কোভিড রোগ প্রতিহত করতে অনেকটাই সক্ষম এবং জনসাধারণকে অনেকটাই নিশ্চিন্তে কর্মক্ষেত্রে যোগদান সহায়তা করেছে। প্রথমক্ষেত্রে লকডাউনের পর ভারতীয় অর্থনীতি অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে যে অর্থনীতি স্তব্ধ হয়ে গেছে এবং চাহিদা অনেকটাই কমে গেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি, বিভিন্ন বেসরকারি এবং সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ভ্যাকসিনেশনের সৌজন্যে জনসাধারণের অর্থনৈতিক চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) বিভিন্ন ক্ষুদ্র কোম্পানিকে ঋণ প্রদান করা, অধিক সময়ে তা শোধ করার সুযোগ দেওয়ায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হওয়ার হাত থেকে মুক্ত হয়েছে।

রাজস্ব ঘাটতি :

অর্থনৈতিক সঙ্কোচনের অর্থ হলো সরকারের রাজস্বের শীঘ্রপতন। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজস্ব ঘাটতি প্রায় ৯.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সরকারের ঘাটতি অনেকটা বেড়ে গেলে সরকারকে বিনিয়োগ বাড়িয়ে ক্ষতিপূরণ মেটাতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মকে এফআরডিআই বিল পূরণ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথমক্ষেত্রে লকডাউনে ভারতীয় অর্থনীতি অকেটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ভারতীয় বিভিন্ন এমএনসি কোম্পানির শেয়ার পতন ঘটছিল। তখন চীনের মতো ভারতের বৈদেশিক প্রতিবেশী দেশ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কিনে ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল কিন্তু ভারত ভ্যাকসিনের প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতিকে অনেকটাই বল প্রদান করে বৈদেশিক শক্তির একচ্ছত্রতা বন্ধ করতে পেরেছিল।

অর্থনৈতিক লাভ : এতকিছু বাধার মধ্যেও ভারতীয় অর্থনীতিতে কিছু উন্নতি ঘটেছে। যেমন পার্চেজিং ম্যানুফ্যাক্টচারিং ইনডেক্স (পিএমআই) বৃদ্ধি ৫৬.৪ মাসিক জিএসটি সংগ্রহ বেড়ে ১.৫ লক্ষ কোটি হয়েছে। যা অর্থনৈতিক গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। ডিজিটাল লেনদেন বা ই-কমার্সের মাধ্যমে আধার কার্ড সংযোগের ফলে অর্থনৈতিক মূল্য অনেকটাই বেড়ে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে। রবিশস্যের উৎপাদন প্রায় ২.৯ শতাংশ বেড়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি : লকডাউনের পরিবহণ বন্ধ থাকার দরুন জিনিসপত্রের দাম অনেকটাই বেড়ে গেছে, যেটা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। সরকার এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগে মুদ্রাস্ফীতিকে কমিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে সক্ষম আত্মনির্ভর করতে হবে।

বর্তমানে ভারতে ভ্যাকসিন উৎপাদন এবং কেন্দ্র সরকারের ভ্যাকসিন কিনে বিভিন্ন রাজ্যে তা সরবরাহ করা এবং ২১ জুন ২০২১ থেকে ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সকলকে টিকাকরণের মাধ্যমে সর্বদেশব্যাপী ভারতীয় অর্থনীতিকে উন্নতি সাধন করেছে। এক্ষেত্রে ন্যাশন্যাল ভ্যাকসিনেশান পলিসি ২০২১ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে বলা যায় বিস্তর ভ্যাকসিনেশন এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্বাস্থ্য নীতি এবং অর্থনৈতিক রূপরেখা নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতে ভারতীয় অর্থনীতিতে আশার সর্বত্তর ঘটবে।

(লেখিকা হেল্‌থ ইকোনোমিক্স রিসার্চার, আরআইএস, বিদেশ মন্ত্রালয়, ভারত সরকার, নিউ দিল্লি, শিক্ষিকা, নেতাজী সুভাষ পাবলিক স্কুল, জিয়াগঞ্জ)

পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদের পরিকল্পনা গরিবের ঘোড়ারোগের মতো

অমিত দাশ

ভারতবর্ষের সংবিধান সভার কোনো কোনো প্রভাবশালী সদস্যের অবান্তর ভাবনাচিন্তার ফলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কিছু ব্যবস্থা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত থেকে গিয়েছে। যদিও ড. বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আচার্য জে.বি. কৃপালনী প্রমুখ সংবিধান সভার বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য উল্লিখিত বিষয়ে যারপরনাই বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

এতদ্ সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে দেশ-পরিচালনায় জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবার মাধ্যমে কেন্দ্রে ও রাজ্যসমূহে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা সংবিধানে সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদা পেয়েছে, সংবিধান-সভার এটি এক মহৎ সাফল্য।

শুধুমাত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মান বজায় রাখবার ইচ্ছায় দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট আইন সভায় লোকসভার যে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসভার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সংবিধানে।

উল্লেখ্য, নিম্নকক্ষ বা লোকসভার সদস্যরা সকলেই জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সমর্থনে নির্বাচিত হন বলে সাধারণভাবে লোকসভাই যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিফলন, সে বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু একইসঙ্গে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সবসময় সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করবার মতো যথেষ্ট পরিণত নাও হতে পারে। অনেকসময় প্রার্থীর সামাজিক বা আর্থিক প্রতিপত্তি, পেশিশক্তি ইত্যাদি ভোটারদের প্রভাবিত করে বলে লোকসভায় নির্বাচিত সদস্যদের মানবিক ও নৈতিক মান উচ্চস্তরীয় না হবার সম্ভাবনাও প্রবল (ইদানীংকালে লোকসভায় নির্বাচিত সদস্যদের বিরুদ্ধে অপরাধ-প্রবণতার যে চিত্র প্রকাশ পায়, তা রীতিমতো চিন্তাজনক)।

উল্লিখিত কারণেই দেশের জ্ঞানী-গুণী-বিচক্ষণ মানুষদের মতামত দেশ চালানোর জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অথচ জ্ঞানী-গুণী মানুষদের অনেকেরই দেশের বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রায়শ তাঁরা নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে অনীহা প্রকাশ করেন— অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের কাজের বিঘ্ন ঘটতে পারে এই আশঙ্কা থেকেও তা করা হয়ে থাকে।

> **মেলা, উৎসব, প্রদর্শনী, ক্লাবকে টাকা দেওয়ার নামে প্রকৃত অর্থেই সরকারি তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর টাকার বহ্ন্যুৎসব চলেছে— কিছুটা অনিয়মিত ভাবে, বিধান পরিষদ চালানোর বিপুল খরচ উল্লিখিত অপচয় সমূহেরই ভিন্ন এক রূপ পরিগ্রহণ মাত্র। তফাত এইটুকুই, শেষোক্ত অপচয়ের রূপটি স্থায়ী।**

স্বভাবতই অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উল্লিখিত জ্ঞানী-গুণী মানুষদের আইনসভার উচ্চতম কক্ষ তথা রাজ্যসভায় নিয়ে আসবার সঙ্গত এক ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হয়েছে। যোগ্য মানুষদের পরামর্শ ও মতামত পেয়ে নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছে দেশ ও জাতি। অর্থবিল-সংক্রান্ত বিষয়সমূহে রাজ্যসভার সদস্যদের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে রাজ্যসভার সদস্যরা প্রায়শ একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

জাতীয় জীবনের সর্বত্র যে অবক্ষয় এসেছে তার প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই রাজ্যসভার উপরও দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহ অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থের প্রতি বেশি নজর দিয়েছে এবং রাজ্যসভার প্রার্থী মনোনয়নের সময়ও তার কোনো ব্যত্যয় হয়নি। ফলে রাজ্যসভার সদস্যদের মানের অবনমন ঘটেছে, আবার অনেক সময় রঙ্গনাথ মিশ্রের মতো তথাকথিত যোগ্য সদস্যদের আচরণে চরম লজ্জাজনক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে দেশকে।

বস্তুত প্রদেশসমূহে জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত সদস্যদের সমাবেশে গঠিত বিধানসভার সঙ্গে সঙ্গে বিধানপরিষদের ব্যবস্থাও তৈরি হয়েছিল অনেকটা রাজ্যসভার আদর্শকে সামনে রেখেই। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, উদাহরণ— বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির প্রতিনিধিদের আইনসভার সঙ্গে যুক্ত করবার একটি ভাবনাও কাজ করেছে।

যদিও স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে আইন সভাসমূহের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে বিধান পরিষদগুলির উল্লেখযোগ্য কোনো অবদানই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সদস্যদের সামান্য কয়েকজন সমাজ ও রাজনীতিতে কিছু প্রভাব ফেলতে পারলেও অধিকাংশের কোনো ভূমিকাই ছিল না। এর অন্যতম কারণ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত অথবা দলীয় স্বার্থের সহায়ক হতে পারবেন, এমন মানুষদেরকেই বিধান পরিষদে নিয়ে আসা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র সেন একজন সৎ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বিধানসভার নির্বাচনে পরাজিত হবার পর বিধান পরিষদের সদস্য হয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীপদ গ্রহণ করে যারপরনাই সমালোচিত হয়েছিলেন। নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা অযথার্থ ছিল না। বস্তুত রাজ্যের উপর, প্রকৃত অর্থে রাজ্যবাসীর উপর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে রাজনৈতিক দলের কিছু মানুষের সরকারি পাদপীঠ গড়ে দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনো ভূমিকা না থাকায় বহু রাজ্যে আইনসভার এই অপ্রয়োজনীয় কক্ষটির বিলোপসাধন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদ বিলোপ সাধনের ব্যবস্থা করে যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যবাসীর আর্থিক বোঝার ভার কমিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছিলেন।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এ রাজ্যে বিধান পরিষদকে আবার জিইয়ে তুলবার ভাবনাচিন্তা করলেও গত দশবছর ক্ষমতায় থাকাকালীন তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। স্বভাবতই অপ্রয়োজনীয় একটা উদ্যোগ থেকে সরকার সরে এসেছে, এমন ভাবা হলেও গত ২০২১-এর নির্বাচনের সময় পুরানো প্রতিশ্রুতিকে আবার হাওয়া ভরে ফুলিয়ে তোলা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনে মনোনয়ন না পাওয়া দলীয় সদস্যদের দলবদল প্রতিরোধ করবার লক্ষ্যে তাদের সামনে লোভনীয় পুনর্বাসনের 'জিলিপি'টি ঝুলিয়ে রাখা। পরিকল্পনাটি একান্তই ব্যর্থ হয়েছে বলা যাবে না।

নির্বাচনে ব্যাপক জয়লাভের পর ইতোমধ্যেই বিধান পষিদের প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়েছে সম্ভবত বেশ বড়ো পরিকল্পনাকে সামনে রেখে। দলদাস বুদ্ধি-ব্যবসায়ীদের জন্য একটি ভালো ও নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করাই যে এই পরিকল্পনার অংশ সেকথা বলাবাহুল্য। পূর্বেও পেটোয়া তথাকথিত বিশিষ্টদের বাঙ্গলা অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্রসদন, শিশু-কিশোর অ্যাকাডেমি-সহ নানা প্রতিষ্ঠানে প্রভুত বেতন/ভাতা ইত্যাদি দিয়ে খুশি করা হয়েছে। এখন খুশি করা প্রয়োজন— এমন মানুষের সংখ্যা স্বাভাবিক কারণেই বেশি হতে বাধ্য।

কিন্তু প্রশ্ন অন্যত্র। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি বর্তমানে ঋণের বোঝায় যথার্থই নুয়ে পড়া অর্থব্যবস্থাকে সম্বল করে টিকে আছে। অর্থের অভাবে সাড়ে পাঁচ লক্ষ সরকারি চাকুরির পদকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। একটিও সরকারি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেই। পুলিশ, পরিবহণ, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই অস্থায়ী কর্মচারীরা উল্লিখিত 'সেবা'কে টিকিয়ে রেখেছে। রাজ্যের ঋণ পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিটি নবজাতক ষাট/সত্তর হাজার টাকার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার সামান্য নির্যাসের পরিচয় স্মরণ করেও কীভাবে একটি সরকার বিধান পরিষদ চালানোর জন্য বছরে বারোশো কোটি টাকার বাড়তি খরচ বহনের মতো অবিমৃশ্যকারিতা করবার কথা ভাবতে পারে, তা ভেবেই বিস্মিত হতে হয়।

সরকার প্রস্তাব গ্রহণ করতেই পারে— সংখ্যার জোর রয়েছে তার। কিন্তু যে প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে আর্থিক দায় বহন করতে হবে দারিদ্র সীমারেখার নীচে অবস্থানরত প্রান্তিক মানুষকেও, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে বইকী? কারণ অপ্রয়োজনীয় এই পরিষদটি গঠন আদতে কিছু বশংবদকে পুরস্কৃত করবার জন্য কোটি কোটি টাকায় মচ্ছব আয়োজন ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

বিধান পরিষদের সদস্যদের পরামর্শই-বা শুনবেন কে? বিশেষত যে রাজ্যে মন্ত্রীদের কথারই কোনো গুরুত্ব নেই। শুধুমাত্র শুভেন্দু অধিকারী নন, বর্তমান মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত নির্বাচনের পূর্বে এক সাক্ষাৎকারে মুখ ফসকে বলেই ফেলেছেন নিজেদের মূল্যহীনতার কথা।

যেখানে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, প্রকৃত অর্থে কর্ত্রী মাত্র একজন, যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার দু'শো চুরানব্বইটি আসনে তাঁকেই প্রার্থী মনে করে ভোটদাতাদের ভোট দিতে বলেছেন, সেখানে বিধান পরিষদের সদস্যদের আলোচনা নিছক গুলতানির অতিরিক্ত হওয়া সম্ভব কি?

নির্বিচারে মেলা, উৎসব, প্রদর্শনী, ক্লাবকে টাকা দেওয়ার নামে প্রকৃত অর্থেই সরকারি তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর টাকার বহ্ন্যুৎসব চলেছে— কিছুটা অনিয়মিত ভাবে, বিধান পরিষদ চালানোর বিপুল খরচ উল্লিখিত অপচয় সমূহেরই ভিন্ন এক রূপ পরিগ্রহণ মাত্র। তফাত এইটুকুই, শেষোক্ত অপচয়ের রূপটি স্থায়ী। ▯

দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে নিউইয়র্ক টাইমসের নতুন ছক

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

বহুশ্রুত একটা ঐতিহাসিক সত্যের পুনরাবৃত্তি করছি। ব্রিটিশরা মুসলমানদের মতো নয়। মুসলমানরা চিরাচরিত কোরান নির্দেশিত পথে হিন্দু নিকেশ করতে করতে ভারতে ঢুকেছে। হিন্দুকুশ পর্বতের কথা আমরা ইতিহাস বইয়ে পড়েছি বাল্যকালে, কিন্তু তাতে একথা বলা ছিল না যে হিন্দুকুশ মানে যেখানে হিন্দু হত্যা করা হয়। তা হলে তফাতটা আসলে কোথায়?

ব্রিটিশরা (পড়ুন খ্রিস্টানরা) প্রথম থেকেই বৌদ্ধিক আক্রমণ শুরু করল। এই কাজে তারা নিযুক্ত করল ম্যাক্সমুলার ও মার্টিন হুইলারের মতো কিছু শিক্ষিত জার্মান বেকার যুবককে প্রতিনিধি বা বেতনভুক চাকর হিসেবে। ম্যাক্সমুলার বললেন ভারতীয় ধর্ম শেষ এবং সেখানে খ্রিস্ট ধর্মকে ঢুকতে হবে। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনকে ভুল বিকৃতভাবে অনুবাদ করা হলো। কোনো প্রমাণ ছাড়াই মিথ্যা রটানো হলো যে, আর্যরা মধ্যএশিয়া বা আনাতোলিয়া থেকে ভারতে ঢুকেছে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রথমে বলল আর্যরা আদি অধিবাসী দ্রাবিড়দের সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করে দ্রাবিড়দের গণহত্যা করে ঢুকেছে; পরে বলল দ্রাবিড়দের সিন্ধু সভ্যতার (আসলে তা হবে সরস্বতী সভ্যতা) স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল এবং আর্যরা বাইরে থেকে অভিগমন করেছিল ভারতে। তাদের রটনার ফলে হিন্দুসমেত বৃহদংশের মধ্যে এই ধারণা চালু হলো যে হিন্দু ধর্ম কুসংস্কার, জাতপাতে দীর্ণ, ভুলভ্রান্তিতে ভরা এক দর্শন এবং খ্রিস্টানদের দায়িত্ব সেই ধর্মকে সরিয়ে তার জায়গায় খ্রিস্টান ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা।

তারা এই কাজকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাইল দু'ভাবে। একদিকে অহিংস আন্দোলন নামে এক বকচ্ছপ মার্কা নীতি যা কোথাও কখনো (ভারতও তার মধ্যে পড়ে), ছিলই না, পরেও কোথাও কখনো হয়নি, তা চালু করল। সেইভাবে হিন্দুদের নিষ্ক্রিয় ও সহিংস-প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন এক দল কাপুরুষে পরিণত করল। একটা মিথ্যা— সাম্যের ধ্বজাধারী, নতুন, বিদেশে প্রতিষ্ঠিত দল, যার মাথায় ছিল কট্টর সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা, তাই তৈরি করল।

স্বাধীনতা বা আসলে পরাধীনতার নতুন পর্ব শুরু হলো ১৯৪৭ সালে হিন্দু বিদ্বেষ দিয়ে। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তারা দেশের বুদ্ধিজীবীদের কিনে নিল। অতি সম্প্রতি হাটে সেই হাঁড়ি ভেঙেছে।

মোদীকে ঘৃণা করতে চান? হিন্দুদের ঘৃণা করতে চান? তা হলে আপনি নিউ ইয়র্ক টাইমসে এখনই আবদেন করুন।

আমরা অনেকদিন ধরেই বলে এসেছি, না বললেও চলত, স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েই বোঝা যায়, ভারত হিন্দুনাশকারী যে শক্তি কাজ করছে, অক্টোপাসের মতো ঘিরে রেখেছে, তা বিনা অর্থব্যয়ে সম্ভব নয়। তবে তার প্রমাণ থাকলেও সরকারের মাথারা নিজেরাই যেখানে হিন্দু বিরোধী, বেতন বা অন্য কিছু প্রাপ্ত, তারা কখনোই সে কথা প্রকাশ করবে না।

নিউইয়র্ক টাইমস ২০২১ সালের ১ জুলাই এক বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তাতে

বোঝা যায়, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে লিখতে প্রার্থীদের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

আমেরিকার জনপ্রিয় জার্নাল নিউ ইয়র্ক টাইমস 'দক্ষিণ এশীয় বিজনেস করেসপন্ডেন্ট'-এর কাজের জন্য তাদের প্রয়োজন আছে বলে জানিয়েছে। খোলাখুলিভাবে একটা উদ্ভট, কিম্ভূতকিমাকার কাজের বর্ণনা দিয়েছে। সেই কাজটা হলো একথা প্রতিষ্ঠিত করা যে 'মোদী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর ভিত্তি করে একটা বলনির্ভর জাতীয়তাবাদকে মদত দিচ্ছেন এবং তিনি বাকস্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করছেন ও আন্তধর্মীয় সমন্বয় নষ্ট করছেন'। এই কথাগুলো অনেকটা আর্বান নকশাল ও সিউডো-সেকুলারদের কথার মতো শোনাচ্ছে।

সব সাংবাদিক, যেমন বরখা দত্ত, রাজদীপ সারদেশাই, সাগরিকা ঘোষ, রাণা, ধান্য রাজেন্দ্রন থেকে তামিলনাড়ুর সেন্টিভেল, গুণশেখরণ, নেলসন জেভিয়ার ও কার্থিগাই সেলভন এই কাজের জন্য যোগ্য হতে পারে, কারণ তারা এই কাজে দক্ষ। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, তারা এই কাজের উদ্ভটত্বকে

"All the News That's Fit to Print"

The New York Times

VOL. CLXX ... No. 59,039 © 2021 The New York Times Company SUNDAY, APRIL 25, 2021

AS COVID RAVAGES INDIA, TRUE TOLL IS UNDERCOUNTED

CREMATIONS NEVER END

Experts Say Total Deaths Far Exceed the Nearly 200,000 Reported

This article is by Jeffrey Gettleman, Sameer Yasir, Hari Kumar and Suhasini Raj.

NEW DELHI — India's coronavirus second wave is rapidly sliding into a devastating crisis, with hospitals unbearably full, oxygen supplies running low, desperate people dying in line waiting to see doctors — and mounting evidence that the actual death toll is far higher than officially reported.

Each day, the government reports more than 300,000 new infections, a world record, and India is now seeing more new infections than any other country by far, almost half of all new cases in a global surge.

But experts say those numbers, however staggering, represent just a fraction of the real reach of the virus's spread, which has thrown this country into emergency mode. Millions of people refuse to even step outside — their fear of catching the virus is that extreme. Accounts from around the country tell of the sick being left to gasp for air as there was at

Cremating the remains of people who died from Covid-19 in East Delhi on Friday. India now accounts for almost half of all new coronavirus cases reported worldwide.

আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এই কথা বলে যে সমস্ত লোকের একটা ক্রিমিনাল অতীত আছে তাদের নিয়োগ করতে কোনো অসুবিধে নেই।

কাজের বর্ণনা দেওয়া বিজ্ঞাপনটা এই রকম :

'নিউ ইয়র্ক টাইমস ভারতের অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে লেখায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন অভিজ্ঞ, উদ্যোগী সাংবাদিক খুঁজছে; ভারত বৈশ্বিক সুপারপাওয়ার হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং তার একটা খুব সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে এবং সে একটা বড়োসড়ো পরিবর্তনের বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে'।

ওই বিজ্ঞাপনের বক্তব্য, ভারত খুব শীঘ্রই জনসংখ্যায় চীনকে ছাড়িয়ে যাবে, যদি ইতিমধ্যেই তা না হয়ে থাকে এবং বিশ্বের মঞ্চে আরও বড়ো নীতিনির্ধারকের ভূমিকা নেওয়ার তার অভিলাষ আছে। মনোমোহিনী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত এশিয়ায় চীনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে। সীমান্ত বরাবর উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং দেশদুটোর রাজধানীতে নাটকীয় তৎপরতা চলছে।

তারা আরও বলেছে ভারতের অভ্যন্তরে রয়েছে নানারকম ভাষা ও জনগণের একটা খিচুড়ি। 'সেখানে তাদের শ্রেণী ও সম্পদের বৈষম্য নিয়ে অনবরত বিবাদ আছে। ভারত একটা পাত্রের মতো যেখানে এই সব জিনিস মিলে মিশে আছে'। এদের মধ্যে একটা উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে যাদের প্রতি আমাজন, ওয়ালমার্টের দৃষ্টি আছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যারা ওয়াল স্ট্রিট ও লন্ডনের বাজারে সমীহ জাগিয়েছে।

এসব সত্ত্বেও নাকি 'ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের সন্তানদের উন্নত জীবনের জন্য সংগ্রাম করছে এবং ভারতের একদা দ্রুত-বর্ধনশীল অর্থনীতি স্তিমিত হয়ে আসার লক্ষণ দেখা দিয়েছে' (!)

ভারতের ভবিষ্যৎ এখন একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। তারা বলতে চায় মোদী হিন্দু সংখ্যাগুরুদের উপর কেন্দ্রীভূত স্বনির্ভর, পেশীবহুল রাজনীতির প্রচার করছে। 'তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক ভারতের স্থপতিদের আন্তঃধর্মীয় ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতির উপর একটা বড়ো আঘাত'। অনলাইন কথাবার্তা ও সংবাদমাধ্যমের আলোচনার উপর খবরদারি চালানোর সরকারি প্রচেষ্টা গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে (!) বিশেষত নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিষয়গুলোকে বাক্স্বাধীনতার সঙ্গে গুলিয়ে দিচ্ছে। এই ব্যাপারে প্রযুক্তি একদিকে সহায়ক ও অন্যদিকে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কাজে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপের মতো দেশগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এদের প্রত্যেকের সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে এবং বিশাল প্রতিবেশীর সঙ্গে জটিল সম্পর্ক আছে।

তারা এমন করেসপন্ডেন্ট চায় যে 'এই সব শক্তিগুলোকে বিশ্বের জনগণের সামনে তুলে ধরবে। সে একজন শক্তিশালী লেখক হবে; ও তার সর্বশেষ সব সংবাদগুলোকে গুলিয়ে ঘেঁটে পরিবেশন করার ক্ষমতা থাকবে। তার ক্ষমতা থাকবে সেইসব খবরের পোক্ত বিশ্লেষণ করা ও একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ (সেটা কী?) থাকবে'। ভারত ও ওই অঞ্চলের জনগণের ব্যাপারে উৎকর্ণ হয়ে থাকা তাদের একটা বিশেষ যোগ্যতা। তবে তারা এমনভাবে লিখবে যেন মনে হবে তারা গভীর চিন্তাভাবনা করে লিখছে।

আদর্শ প্রার্থী সাংবাদিকদের একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা থাকবে, যেটা এইরকম একটা বিশাল অঞ্চলের খবর পরিবশেন করার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আদর্শ প্রার্থীদের জন্য যেসব গুণাবলী থাকা আবশ্যিক মনে করছে এই বিশ্বখ্যাত পত্রিকা যারা নিজেদের উচ্চ উদার মানবিকতার বাহক করে প্রচার করে সেইসব গুণাবলী হলো :

১। ভারতবর্ষ, সন্নিহিত অঞ্চল এবং বিশ্বে তার অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান।

২। আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতার, বিশেষত কোনো বৈশ্বিক সংবাদ সংস্থায় বিস্তৃত অভিজ্ঞতা।

৩। বহু ভাষায় কাজ করার অভিজ্ঞতা।

৪। খবর ও অন্যান্য কাহিনির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাংবাদিকতা ও লেখালেখির ফলে জন্মায়।

৫। নিউ ইয়র্ক টাইমসের কৌশল, মান ও লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের কোনো কিছুই ধার ধারে না, এমনকী আইন দ্বারা সুরক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্য তাদের না থাকলেও চলবে। নিউ ইয়র্ক টাইমস কোম্পানি যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে যদি উপরোক্ত গুণাবলী থাকে, তাদের মধ্যে সেইসব ব্যক্তিও বিবেচনাযোগ্য হবে যাদের ক্রিমিনাল ইতিহাস আছে শুধু যে দেশের কথা ভাবা হচ্ছে তার জন্য যা দরকার তা থাকলেই হবে এবং স্থানীয় 'ন্যায়সঙ্গত সুবিধা' আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই হবে।

সারাংশ দাঁড়াল :

১। মোদী-বিদ্বেষীদের দরকার। ২। এমন একজন যে হিন্দুবিদ্বেষকে একটা বৌদ্ধিক চেহারা দিতে পারবে। ৩। আর্বান নকশালদের দরকার। ৪। কীভাবে এই ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা যায় সেটা নিয়ে ভাবতে হবে।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়া বনাম রাষ্ট্র

মৈনাক পূততুণ্ড

ভারতীয় রাজনীতিতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সামাজিক মাধ্যমগুলির ভূমিকা বহুমাত্রিক ও বহুবিতর্কিত। ভারতে দ্রুত বাড়তে থাকা ইন্টারনেট ব্যবহার এবং বিপুল সংখ্যক অল্প বয়সি ব্যক্তিদের কাছে ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়াই পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা ও সংবাদ সংগ্রহের মুখ্য মাধ্যম হয়ে ওঠায় ভারত বহুজতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য বিশ্বের বাজারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ভোট প্রচার, সমর্থক ও সংগঠকদের মধ্যে যোগাযোগ রাখা এবং নেতৃত্বের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে, অন্যদিকে এগুলিই হয়ে উঠেছে তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ, অসত্য বা অর্ধসত্য খবর বিতরণ ও বিপজ্জনক গুজব ছড়ানোর মুখ্য মাধ্যম।

অথচ ভারতে এই মাধ্যমের উপর একমাত্র নিয়ন্ত্রক হিসেবে ছিল দূরদর্শী স্বর্গত প্রমোদ মহাজনের নেতৃত্বে দু' দশকেরও বেশি আগে তৈরি হওয়া তথ্যপ্রযুক্তি আইন। ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের নেহাতই শৈশবে তৈরি এই আইনের কিছু ধারায় বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা ও তৎসম্পর্কিত শাস্তিবিধানের বিষয়গুলি ছিল কিছুটা অস্পষ্ট এবং কখনো কখনো দল নির্বিশেষে অপব্যবহারের দোষে দুষ্ট। বিশেষ করে এই আইনের ৬৬-এ উপধারা সংবিধানের ১৯নং ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারের বিরোধী বলে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল যা সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালে আদালতের নির্দেশে উপধারাটি বাতিল হয়ে যায়। যদিও এই আইনের অন্যান্য অংশগুলি এখনও সক্রিয় এবং আই.পি.সি.-র বিভিন্ন ধারাও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য প্রযোজ্য। তা সত্ত্বেও ভারতে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে বৈপ্লবিক বৃদ্ধি ও এই মাধ্যম-বাহিত বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির উপর প্রায় কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকার সুযোগে দেশবিরোধী শক্তিগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করছিল। যার প্রমাণ হিসেবে কখনো পাওয়া যায় দিল্লিতে কৃষক বিক্ষোভের নামে যে মধ্যস্বত্বভোগীদের আন্দোলন চলছে সেখানে আরও অস্থিরতা সৃষ্টির ব্লু-প্রিন্ট হিসেবে বিশ্ব পরিবেশের স্বঘোষিত অভিভাবক গ্রেটা থুনবারগের টুইট করা 'টুলকিট' অথবা টুইটারের হঠাৎ করে প্রকাশ করা কাশ্মীরহীন ভারতবর্ষের ম্যাপ।

দেশের প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলি এই বিষয়গুলিতে বুড়িছোঁয়া করে দ্রুত কেন্দ্রীয় সরকারের মুণ্ডপাত এবং কেন কোনো কোনো বিজেপি নেতা বা হিন্দু সংগঠনের তথাকথিত 'হেট স্পিচ' ফেসবুক সরিয়ে নিচ্ছে না, সেই আলোচনায় তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছে। হেট স্পিচ ইস্যুতে মিডিয়ার ও ফেসবুকের ভিতরেই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর চাপের সামনে ফেসবুকের এক উচ্চ পদাধিকারীকে ইস্তফা পর্যন্ত দিতে হয়েছে, যদিও সোশ্যাল মিডিয়াতে বাম-অতিবাম ও বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর নাগাড়ে হিন্দুবিরোধী প্রচারের কোনো বিরাম নেই। 'লিবারাল' মিডিয়া, প্রযুক্তি সংস্থা ও একদল সুসংবদ্ধ উস্কানিদাতার এই জোটবদ্ধ আক্রমণ ভারতীয় রাজনীতির একটি পরিচিত থিম হয়ে দাঁড়িয়েছে অথচ এই মত্ত হস্তীকে নিয়ন্ত্রণের যে কোনো চেষ্টাকেই বাক্‌স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপর আঘাত বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। মধ্যযুগের ইউরোপে বণিকদের সংগঠন হিসেবে গিল্ডগুলি অনেক সময়েই নগর-রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। ঔপনিবেশিক ভারতেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের ইতিহাস রয়েছে। উত্তর-শিল্পায়ন বা পোস্ট-ইনডাস্ট্রিয়াল যুগে প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষাও অনেক জটিল হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি অন্য কোনো বিশেষ দেশের সীমানায় আবদ্ধ নয় এবং সামগ্রিকভাবে তাদের কোনো নির্দিষ্ট দেশের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করাও অসম্ভব। ইরান বা চীনের বজ্রকঠিন সাইবার নিষেধাজ্ঞাও এই দেশগুলিতে ফেসবুক বা টুইটারের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করতে পারছে না। ইসলামিক ব্রাদারহুডকে ইজিপ্টে ক্ষমতার কেন্দ্রে নিয়ে আসা 'আরব বসন্ত' নামধারী আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা ইতিমধ্যেই বহুচর্চিত হলেও পুনরায় স্মর্তব্য যে ২০০৮ সালে, 'বিপ্লবের' অনেক আগেই কিছু বাছাই ইজিপশিয়ান তরুণ নিউ ইয়র্কে খোদ গুগল ও ফেসবুকের কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলন

সংগঠিত করায় প্রশিক্ষিত হয়েছিলে যার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি এই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানকারী বৃহৎ সংস্থাগুলি বা 'বিগ টেক'-এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি আলাদা মডেল বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যার এক মেরুতে রয়েছে চীন এবং অন্য মেরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

'বাজারমুখী সমাজতন্ত্র'-র নীতির আড়ালে চীন এখন ঘোরতর পুঁজিবাদী, কিন্তু এই পুঁজিবাদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এবং উদারবাদের রাজনৈতিক দিকটি সেখানে সযত্নে পরিত্যক্ত। এই মডেল অনুসারেই চীনে ইন্টারনেট ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বহুল ব্যবহৃত কিন্তু কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই জারি হয় এমন কিন্তু নয়; চীনে 'সেলফ-সেন্সরশিপ' বা নিজে থেকে আপত্তিজনক, পর্নোগ্রাফিক এবং দেশ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কন্টেন্ট না দেখানোর পক্ষে এক জোরালো সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। যদিও এটা খুবই স্পষ্ট যে চীন দেশব্যাপী সেন্সরশিপের প্রকৃত উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ করা কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে চীন পশ্চিমি দুনিয়ার প্রযুক্তির ভরসায় না থেকে যেভাবে নিজস্ব সার্চ ইঞ্জিন, অ্যাপ, মাইক্রো-ব্লগিং পরিষেবা সমন্বিত একটা সম্পূর্ণ দেশীয় ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলেছে তাতে বিদেশি সংস্থাগুলি বাধ্য হয়েছে চীনের সামনে মাথা নত করতে। দেশীয় চ্যালেঞ্জের সামনেও চীন এইরকম কঠোর থেকেছে। চীনের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ই-কমার্স সংস্থা আলিবাবার প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা সম্প্রতি ক্রমাগত সরকার বিরোধী প্রচার করছিলেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চকে ব্যবহার করে চীনা সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানকে অপদস্থ করছিলেন। এর পরেই এই ধনকুবের গত বছরের অক্টোবর মাসে যেন বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছিলেন। ২০২১ সালেও তাঁকে একবারের বেশি জনসমক্ষে দেখা যায়নি। তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় আলি-পে ই-পেমেন্ট প্লাটফর্মের নিয়ন্ত্রক 'অ্যান্ট গ্রুপ' ও মূল 'আলিবাবা', দুটি সংস্থাকেই চীন সরকার জাতীয়করণ করার কথা ভাবছে বলে জানা যাচ্ছে। এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ বহুজাতিকের রমরমার যুগেও রাষ্ট্রের অমোঘ ক্ষমতার কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়।

মুদ্রার উলটো পিঠে আমেরিকার সাম্প্রতিক উদাহরণও রয়েছে। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগ ওঠা ও তারপর একদল ট্রাম্প সমর্থকের আইনসভা আক্রমণের ঘটনার পর ফেসবুক, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি প্রায় সকল সামাজিক মাধ্যম তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যান করে দিয়েছিল। সিএনএন, এমএসএনবিসি-র মতো আমেরিকার বিখ্যাত খবরের চ্যানেলগুলি একজন ক্ষমতাসীন মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদী বলতেও পিছপা হয়নি। এমনকী আমাজন সম্প্রতি তাদের 'পার্লার' নামের একটি জনপ্রিয় অ্যাপকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে যেটিতে মূলত ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের সমর্থকরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সিলিকন ভ্যালির নব্য পুঁজিপতিদের সঙ্গে ট্রাম্পের এই বিরোধকে অনেকে বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্র ও বাজারের বিরোধ হিসেবে দেখতে নাও চাইতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পগুলিকে সরিয়ে পরিষেবা ক্ষেত্র দীর্ঘদিন ধরেই বাজারের নিয়ন্ত্রক হিসেবে উঠে এসেছে। আমেরিকার মতো উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর দেশের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য।

সমকালীন বাস্তবকে মাথায় রেখেই তাই ভারতের প্রয়োজন ছিল সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার একটি সময়োপযোগী ব্যবস্থা। ২০১৮ সালে তেহসিন পুনাওয়ালা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণের জন্য সরকারকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়। কোর্টের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বর্তমান বছরের জুন মাসে ভারত সরকার নতুন তথ্যপ্রযুক্তি বিধি প্রকাশ করেছে। এই বিধি একদিকে যেমন 'ইন্টারমিডিয়ারি' বা নিছক প্রকাশক হিসেবে ট্যুইটার প্রভৃতি সংস্থাগুলির তাদের প্লাটফর্মে হওয়া দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করেছে, তেমনি উস্কানিমূলক বা ফেক পোস্টের ক্ষেত্রে 'ফার্স্ট ওরিজিনেটর' বা যে প্রথম সেই পোস্ট ছড়িয়েছে তাকে চিহ্নিত করাও বাধ্যতামূলক করে তুলেছে। এই ধরনের কোনো পোস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তার নিষ্পত্তির জন্য একজন 'চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার' নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যিনি হবেন একজন ভারতীয় নাগরিক। এছাড়াও ও.টি.টি. অর্থাৎ অনলাইন ভিডিয়ো, সিনেমা প্রভৃতি দেখানো সাইটগুলি, যাদের অনেকেই আইনি দুর্বলতার সুযোগে বয়সের বিষয়টি উপেক্ষা করে কার্যত পর্নোগ্রাফি দেখিয়ে চলেছে, তাদের জন্য নতুন বিধিতে প্রাপ্তবয়স্কদের উপযুক্ত কন্টেন্টকে লক করে রাখা, কোনো অভিযোগ উঠলে তার জন্য ত্রিস্তরীয় সমাধানের ব্যবস্থা ও একটি 'কোড অব এথিক্স' মেনে চলার কথ বলা হয়েছে।

এই বিধি লাগু হওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে মে মাসের শেষ সপ্তাহ অবধি সময় দেওয়া হয়েছিল এবং বেশিরভাগ সংস্থা এই অনুযায়ী পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু বাক্‌স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে ফেসবুক-পরিচালিত হোয়াটসঅ্যাপ ও ট্যুইটার এ বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। সঙ্গী হয় কট্টর বিজেপি বিরোধী বলে পরিচিত 'দা ওয়্যার' অনলাইন ম্যাগাজিনের প্রকাশক সংস্থা। মজার ব্যাপার হলো, যে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের এত আগ্রহ, তাদেরই ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রি করা এবং গ্রাহককে না জানিয়ে তাদের তথ্য শেয়ার করার অভিযোগে অভিযুক্ত এই সংস্থাগুলি। দিল্লি হাইকোর্টে এ বিষয়ে তীব্র ভর্ৎসনা শোনার পরেও হোয়াটসঅ্যাপ এখনও ২০১৯ সালে পার্লামেন্টে প্রস্তাবিত 'পারসোনাল ডেটা প্রটেকশন বিল' পাশ না হওয়ার দোহাই দিয়ে নিজেদের আড়াল করতে চাইছে। অতি সম্প্রতি ট্যুইটারও আদালতের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত একজন ভারতীয় 'গ্রিভান্স অফিসার' নিয়োগে বাধ্য হয়েছে। ভারতের আইন-আদালতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজেদের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় অবিচল থাকাই এদের লক্ষ্য। কাজেই এই বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদমাধ্যমের ক্রমাগত নেতিবাচক প্রচারকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকার যে কঠোর মনোভাব নিয়েছে তা শুধু প্রশংসাযোগ্যই নয়, জাতীয় স্বার্থে একান্তই প্রয়োজনীয়।

(লেখক কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের সরকারি অধ্যাপক)

আল আমিন কেন স্কুল খোলে না?

সোমেশ্বর বড়াল

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষিত হলেই বিভিন্ন খবরের কাগজ ও অন্যান্য গণমাধ্যমে বড়ো বড়ো করে খবর করা হয়— 'আল আমিনের' সাফল্য—'মিশনের ছাত্ররা' মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন কোন স্থান অধিকার করেছে ইত্যাদি। কিন্তু কোথায় কোন স্কুলে এরা পড়ে? আল আমিনের কটা স্কুল আছে এরাজ্যে? কোন বোর্ডের অনুমোদিত এইসব স্কুল? সেগুলোতে কোন মাধ্যমে পড়ানো হয়? পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও আল আমিন মিশন নামে কোনো স্কুলের নাম পাবেন না। এসব প্রশ্ন গদ গদ মিডিয়া তোলে না। এরাজ্যে দূরের কথা, সারা দেশে এই আল আমিন মিশনের কোনো সরকার স্বীকৃত বোর্ড অনুমোদিত স্কুল আছে কি? —না এরা শুধুই ছাত্রাবাস চালায়? বিশাল বিশাল সেইসব ছাত্রাবাসের পরিকাঠামো সরকারি স্কুল তো বটেই বহু নামি বেসরকারি স্কুলকেও হার মানায়। তাহলে এই ছাত্র-ছাত্রী যাদের নিয়ে মিশন অহংকার করে, বিজ্ঞাপন দেয় তারা কারা? প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তারা নাকি আল আমিনের হোস্টেলে থাকে, সেখানেই ক্লাস করে আর বছরের পর বছর বিভিন্ন সরকারি স্কুল থেকে 'রেগুলার' পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেয়। সরকারি ভাবে তারা ওই সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী কিন্তু আল আমিন এমনভাবে বিজ্ঞাপন দেয় বা বাঙ্গলার মিডিয়া এমনভাবে খবর করে যেন আল আমিন কোনো স্কুল চালায় আর সেইসব স্কুল থেকেই এরা পরীক্ষা দেয়।

হোস্টেল চালানো কি অপরাধ? একদম নয়। বহু সংস্থা এভাবে হোস্টেলে ছাত্র-ছাত্রী রাখে যারা অন্য সরকারি স্কুলে পড়ে। সরকারি স্কুলে ভর্তি না হয়ে কি মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক দেওয়া যায় না? অবশ্যই যায়। তাহলে আল আমিনের দোষটা কোথায়? সরকারি নিয়মে কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় বসতে হলে সেই স্কুলে ভর্তি হয়ে, সেখানে রেজিস্ট্রেশন করে, সেখানেই শিক্ষাবর্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাস করতে হবে। স্কুলের বাইরে থেকে ক্লাস করে পরীক্ষা দিলে প্রাইভেট বা বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য হতে হবে। এছাড়া মুক্ত বিদ্যালয় থেকে তারা পরীক্ষায় বসতে পারে। নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিলে যে 'মর্যাদা' থাকে প্রাইভেট বা বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে তা থাকে না বলেই বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে তা চায় না। তাছাড়া আল আমিনের হোস্টেলে থাকা পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও চাইবেন না যে তাদের ছেলে-মেয়ে প্রাইভেট বা বহিরাগত পরীক্ষার্থীর তকমা সারা জীবন বহন করুক। এক্ষেত্রে তারা মিশনে ছেলে বা মেয়েকে রাখবেন না। সর্বোপরি, বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা শুধুমাত্র সরকারি বোর্ড অনুমোদিত বিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে পড়া ছেলেমেয়েরাই পেয়ে থাকে। আর আমিন কী করে? তারা তাদের হোস্টেলে ছেলে-মেয়েদের রেখে, একদম স্কুলের মতো করে ক্লাস করায়, সংলগ্ন সংখ্যালঘু এলাকার কোনো স্কুলে ছেলে-মেয়েদের নাম লিখিয়ে রাখে কিন্তু ছেলেমেয়েরা সেখানে মোটেও যায় না এবং নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেয়। মজার কথা, যেই দেখা গেল কোনো ছাত্র-ছাত্রী খুব ভালো ফল করেছে অমনি তারা— 'আমাদের ছেলে-মেয়ে বলে' দাবি করতে থাকে। এটি সরকারি নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী অথচ বছরের পর বছর তারা এটা করে চলেছে আর এক শ্রেণীর মিডিয়া উদ্‌বাহু হয়ে সেই খবর করে চলেছে। সরকার শুধুমাত্র যে নীরব তাই নয় 'শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের' জন্য এই আল আমিনের কর্ণধারকে বহুবার সম্মানিত করেছে।

ইতিমধ্যে 'আল আমিন এডুকেশনাল কাউন্সিল' গঠিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো অন্যতম অনুমোদনকারী বোর্ড হিসেবে এটা স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। ১৯৯৯ সালে মেয়েদের বিদ্যালয়ের জন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন নয়া দিল্লির মাওলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন থেকে ৩৫ লক্ষ টাকার অনুদান পেয়েছিল। রাজারহাটে ক্যাম্পাসের জন্য আল-আমিন মিশনকে বামফ্রন্ট সরকার প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের জমি দিয়েছিল। বিশাল পরিকাঠামো সত্ত্বেও আল আমিন সরকারি বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে নিজস্ব স্কুল খোলে না। আর্থিক লাভ বন্ধ হয়ে যাবে বলে? আল আমিনের সব ছাত্র-ছাত্রী বিনা পয়সায় পড়ে না। আর্থিক লাভ তো দেশের হাজার হাজার বেসরকারি স্কুল করে কিন্তু তাদের স্কুলগুলো তো বিভিন্ন বোর্ডের অনুমোদিত। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেভাশ্রম সঙ্ঘ-সহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তো কোনো না কোনো বোর্ডের অধীন। দেশ জুড়ে সরস্বতী শিশু মন্দিরগুলো কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের বোর্ডের মান্যতাপ্রাপ্ত। এরা কেন শুধু 'হস্টেল' হয়ে থাকতে চাইছে? নিজেদের স্কুল থেকে ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিলে সেতো আরও গৌরবের হতো। তাহলে কেন তারা কোনো বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে হোস্টেলগুলো বিদ্যালয়ে পরিণত করছেন না? তাহলে কি ধরে নিতে হবে শুধুমাত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির বাইরে থাকার জন্যই তারা স্কুল খুলছে না? নাকি সরকারি নজরদারির আওতায় থাকলে স্কুলে 'আদর্শ ইসলামিক' পরিবেশ বজায় রাখা যাবে না?

শুধুমাত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির বাইরে থাকার জন্যই কি তারা স্কুল খুলছে না? নাকি সরকারি নজরদারির আওতায় থাকলে স্কুলে 'আদর্শ ইসলামিক' পরিবেশ বজায় রাখা যাবে না?

এভাবেই কি মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্থানীয় স্তরে কিছু লোককে ছলে, বলে, কৌশলে ম্যানেজ করে এক সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া হবে যার মূল লক্ষ্য নিষ্পাপ শিশুদের দেশের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা? এই প্রতিবেদনে আল আমিন কর্ণধারকে তিনটি প্রশ্ন করা যেতে পারে :

১। আপনাদের এত বৃহৎ পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কেন বিধিবদ্ধ স্কুলে সেগুলো পরিণত করছেন না?

২। আপনাদের হস্টেলে থাকা ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়?

৩। তারা কি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেয়? আপনাদের ছাত্ররা সেইসব স্কুলে ক্লাস করতে যায়? ▯

তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের গণহত্যার বত্রিশ বছর পূর্তি

সৌমিত্র সেন

আন্তর্জাতিক স্তরে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও শিহরণ জাগানো ছাত্রহত্যার অকুস্থল তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে ঠিক কী হয়েছিল— আজ ঘটনার ৩২ বছর পর তার কালো দলিলটা সামনে আনবার সামান্য একটি প্রয়াস করছি মাত্র। মূলত ১৯৮০-র দশকে চীন ব্যাপক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগের একচেটিয়া ছাড়পত্র দিতে শুরু করলো চীনের তৎকালীন ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি। দো জিয়াও পিঙের আশা ছিল হয়তো এই বেসরকারিকরণের ফলে জীবনযাত্রার মান বাড়বে ও অর্থনৈতিক উন্নতি সুনিশ্চিত করবে। কিন্তু বাস্তবে এর ফলে সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেল এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা উন্মুক্ত হয়ে পড়লো। চীন সরকারের সংস্কারগুলির কারণে চীনে সীমিত আকারে পুঁজিবাদের সূচনা হয়েছিল। হাত ধরাধরি করে এলো মুদ্রাস্ফীতি এবং সরকারি আমলাদের আর্থিক দুর্নীতি। এর সঙ্গে দরিদ্রতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান হ্রাস বড়ো সমস্যা হয়ে দেখা দিল। অর্থনৈতিক অসাম্য ও উদারীকরণের ফলে বহু চীনা নাগরিকের বিদেশি ধারণা ও উন্নত জীবনযাপনে আসক্তি জন্মালো। এছাড়া চীনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত বাজার পুঁজিবাদের উপাদানগুলির সঙ্গে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়নি যার দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করা যেত— এরকমটাই শিক্ষার্থীদের যুক্তি।

৮০-র দশকের মাঝামাঝি চীন সরকার কিছু সংখ্যক নাগরিককে (মূলত বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী) রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু এইসব নিয়ে স্থানে স্থানে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হতে থাকে। এছাড়াও ছাত্রদের মূল দাবিই ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা। ছাত্র অসন্তোষের কারণে ১৯৮৬-র শেষের দিকে ছাত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। অপরাজেয় জেদে ছাত্রদের চোয়াল শক্ত হতে থাকে। স্লোগান, বক্তৃতা ও বিপ্লবের গানে পরিমণ্ডল মুখরিত হয়ে ওঠে। ১৯৮৭-র শুরুতে কট্টরপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) দমন নীতির মাধ্যমে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর অত্যাচার শুরু করলো। এই দমন নীতির মূল ছিলেন হু ইয়াও বাং যিনি সিসিপি-র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর নির্দেশে ও ইন্ধনে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে ছাত্র আন্দোলন বৃহৎতর ব্যাপক আকার ধারণ করে। এপ্রিলে হু-র মৃত্যুতে বিক্ষোভকারী ছাত্ররা একত্রিত হলো। হু-র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কাতারে কাতারে ছাত্ররা জমায়েত করলেন ও বাকস্বাধীনতার পক্ষে ও কঠোর সেন্সরশিপের বিপক্ষে সোচ্চার হলেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবিতে পরিবেশ অশান্ত হতে থাকে। তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার প্রতিবাদের মঞ্চ হয়ে ওঠে। পরের সপ্তাহগুলিতে বিপুল সংখ্যায় ছাত্র সমাবেশ হতে থাকে বেজিংয়ের অন্যতম প্রধান স্থান তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে। মে মাসে সাধারণ নাগরিকও এই বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনে শামিল হতে থাকেন।

চীন সরকারের কিছু নেতা যদিও ছাত্রদের প্রতি নরম পন্থার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু অধিকাংশই ছিলেন কট্টরপন্থী। ১৩ মে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন যা সারা চীনে অনুরূপ ধর্মঘট ও বিক্ষোভকে ইন্ধন জুগিয়েছিল ও উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই সময়ে বেজিঙে ৪ দিন ব্যাপী প্রথমবার সোভিয়েত কমিউনিস্ট ও চীনা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে Sino-Soviet Summit শুরু হচ্ছিল। যদিও এই Summit ইতিবাচক ভাবেই সুসম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে বেজিঙে সমবেত হওয়া প্রচুর দেশি, বিদেশি ও পশ্চিমের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের সম্মুখে ক্রমশ অশান্ত ছাত্র আন্দোলনের দরুন চীন সরকারের মুখ কালিমালিপ্ত হয়। আন্দোলনকারীদের কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তা নিয়ে সরকার ও পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়। হু ইয়াও বাঙের উত্তরসূরি ঝাও ঝিয়াং বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সঙ্গে কিছুটা হলেও মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু লি পেং এবং দেং ঝিয়াওপিঙের মতো কট্টরপন্থীর ছাত্র বিক্ষোভ বলপূর্বক দমনের সমর্থনে সোচ্চার হন।

কট্টরপন্থীদের একচেটিয়া ইচ্ছায় মে মাসের শেষ দু' সপ্তাহে চীনে সামরিক আইন বলবৎ হলো। বেজিং শহর ঘিরে সেনা সমাবেশ করানো হলো। যখনই সেনা তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের দিকে এগোতে শুরু করে তখন বেজিঙের বিপুল জনতা শহরের সকল রাস্তায় সমবেত হয়ে শহর অবরুদ্ধ করে তোলে। বিক্ষোভরত ছাত্ররা তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের উত্তর প্রান্তে Statue of Democracy-র কাছে অবস্থান করতে থাকে। বিদেশি সাংবাদিকরাও বিক্ষোভস্থল থেকে live coverage দিচ্ছিলেন।

সব কিছু হতবাক করে আচম্বিতে ৩-৪ জুন ট্যাঙ্ক ও বিভিন্ন রণসজ্জায় সজ্জিত সেনাবাহিনী তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের দিকে আগুয়ান হয় এবং গুলিবর্ষণ শুরু করে। সেনাবাহিনীর আক্রমণকে রুখতে নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকগণ বাধা দেবার চেষ্টা চালায়। ওই স্কোয়ারেই ছাত্র-সহ অন্যান্য প্রতিবাদকারীরা সাত সপ্তাহ অবস্থান করছিল। কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার নাগরিককে হত্যা করা হয়। চীন সরকার এ বিক্ষোভকে পালটা বিপ্লব দাঙ্গার কথা বলে প্রচার চালায়। সরকারি হিসেবে ২৪১ জন মারা যায় আর কম-বেশি ৭০০০ জন আহত হন বলে প্রচার চালানো হয়। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আন্দোলন দমন করে সেনাবাহিনী। এই বিষয়ে কোনোরূপ সংবাদ পরিবেশন, আলোচনা ও স্মরণ সভা করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বিক্ষোভকারী ও তাদের মদতকারীদের গণ হারে গ্রেপ্তার করা হয়। অনেক বিক্ষোভকারী ছাত্র বিদেশে পালিয়ে যায়। ৫ জুন সকাল পর্যন্ত সেনা সব এলাকাগুলিতে অধিকার কায়েম করে। 'রাষ্ট্র বনাম ছাত্র'র অসম লড়াইয়ের সাক্ষী হয়ে থাকলো সারা দুনিয়া। চীনের নির্লজ্জ সরকার। বিক্ষোভকারীদের প্রতি কোনোরূপ নমনীয়তা প্রদর্শন করেনি। ঝাও জিয়াঙের পরিবর্তে জিয়াং জেমিনকে পার্টির নেতৃত্বে আনা হয়। রাজনৈতিক সংস্কার মুখ থুবড়ে পড়ে। কমিউনিস্ট শাসকের ছাত্র গণহত্যার এক কালো দলিল এই ভাবেই বিশ্বদরবারে পেশ হয়।

‘স্বস্তিকা’র কথা

সাপ্তাহিক ‘স্বস্তিকা’র সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। মাঝে একদিন প্রাক্তন সম্পাদক, প্রীতিভাজন বিজয় আঢ্যের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। নানা প্রসঙ্গ হতে হতে স্বাভাবিক ভাবেই ‘স্বস্তিকা’র কথা এসে গেল! আমি দীর্ঘদিন ‘স্বস্তিকা’ পড়ছি শুনে প্রিয় বিজয় আঢ্য খুবই উৎফুল্ল হলেন। বিজয়বাবু বললেন, ‘পত্রিকার সঙ্গে আপনার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক রয়েছে। তাই ‘স্বস্তিকা’ সম্বন্ধে কিছু লিখুন।’ প্রীতিভাজনের অনুরোধ ফেলতে পারলুম না। তাই পাঠকদের সামনে ‘স্বস্তিকা’র প্রসঙ্গ দু-চার কথায় তুলে ধরছি।

আমি তখন বি.এ. ক্লাসের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। শ্যামবাজার ‘পলি বুকস্টলের’ সামনে দাঁড়িয়ে নানা ধরনের পত্রপত্রিকা নাড়াচাড়া করছি এমন সময় দড়িতে ঝোলানো নানা পত্রিকার মধ্যে ‘স্বস্তিকা’ চোখে পড়ল। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে ও দেখতে দেখতে বড়োই আনন্দ হলো। লক্ষ্য করলুম পত্রিকাটি নির্ভেজাল দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত, সুস্থ-রুচিসম্পন্ন, মননশীল ‘সংবাদ-সাপ্তাহিক’। এইরকম একটি পত্রিকার জন্যে মন আমার দীর্ঘদিন ধরে আকুল হয়েছিল। আজ সেই চহিদা পূরণ হওয়ায় আনন্দ ও স্বস্তি পেলাম। সময়টা ছিল ১৯৫৯ সাল।

তারপর এতদিন-মাস-বছর ধরে ‘স্বস্তিকা’ আমার সঙ্গী। ‘স্বস্তিকা’ এখন ৭৩ বছরে চলছে। প্রতিষ্ঠার দিন তারিখ আমার জানা নেই! মনে হচ্ছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই পত্রিকার যাত্রা শুরু। সেই সময়ে পত্রিকার সঙ্গে কর্মীরা গেয়ে উঠেছিলেন হয়তো রবীন্দ্রনাথের সেইগানের কলি, ‘মোদের যাত্রা হলো শুরু, ওগো কর্ণধার, তোমায় করি নমস্কার। বাতাস উঠুক, তুফান ছুটুক ফিরব নাকো আর।’

প্রথমে ছিল ১২ পৃষ্ঠার ‘ট্যাবলয়েড’ পত্রিকা। প্রথম পৃষ্ঠায় মূল খবর, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা, তৃতীয় পাতায় ‘সম্পাদকীয়।’ একবার এই দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের ‘বেকারভাতা’ প্রসঙ্গে সহজ-সরল, সাবলীল ভঙ্গিতে আমার একটি রচনা বেরিয়েছিল। যতদূর জানি পাঠক মহলে লেখাটি খুবই সমাদৃত হয়েছিল। ‘চিঠিপত্র বিভাগ’ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিঠি প্রকাশিত হতো। ‘আজও হয়, ধীরে ধীরে সেই ট্যাবলয়েডের জায়গায় স্থান করে নিল আজকের ‘বুক-ফর্ম’ আকারের পত্রিকা। পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা, উদ্যম, বুদ্ধি-বিবেচনার ফল বর্তমানের ‘বুক-ফর্ম’ পত্রিকা। সুদৃশ্য প্রচ্ছদের পর প্রথম পৃষ্ঠায় থাকছে ‘সম্পাদকীয়’। তথ্য ও যুক্তি নির্ভর এই সম্পাদকীয় প্রতিটি সংখ্যার ‘মূল সুরকে’ তুলে ধরছে। এই দীর্ঘ সময়ে পত্রিকার তিনজন সম্পাদকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। প্রথম জন পরম প্রিয় সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় ব্যক্তি সকলের নিকটজন ভবেন্দু ভট্টাচার্য (প্রিয় ‘ভবেন্দু-দা’), পরিশেষে আছেন প্রীতিভাজন বিজয় আঢ্য।

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনার সময় আমার ‘স্বস্তিকা’ পড়া শুরু। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। পত্রিকা কেমন লাগছে, তার খোঁজখবর নিতেন। অমায়িক ব্যবহারের একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ। পত্রিকা ভালোই চলছিল। এমন সময় নেমে এল ‘জরুরি অবস্থা’। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রুদ্ধ করে দিলেন! গণতন্ত্রপ্রিয় ব্যক্তি-মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সকল কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল! সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ব্যবস্থা হতে মুক্ত হতে পারলেন না! তাঁর জীবনেও ঘটল লাঞ্ছনা। কিন্তু সেই অবস্থাতেও পত্রিকা বন্ধ হয়নি! নিবেদিত কর্মীরা ছোটো আকারেও পত্রিকা প্রকাশ করেছেন সংযতভাবে। এরপর এক সময় এই ‘জরুরি অবস্থা’ উঠে গেল। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থ মনে আবার পত্রিকা চালাতে লাগলেন। তারপর একদিন আকস্মিক প্রয়াণে পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁর অনেক ভাবনা-চিন্তা অপূর্ণ রয়ে গেল!

এবার এলেন শ্রী ভবেন্দু ভট্টাচার্য। স্বল্প সময়ে সহৃদয় ব্যবহারে পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট সকলজনের প্রিয় ‘ভবেন্দু-দা’। ওনার সঙ্গে আমারও পরিচয় হলো। একবার পত্রিকার উত্তরবঙ্গের ‘চা-বাগান’ সম্বন্ধে ‘স্বস্তিকা’র একটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। সংখ্যাটি খুবই সমাদৃত হয়েছিল। ভবেন্দু-দা আমাকে ইংরেজি থেকে এই ব্যাপারে একটি লেখা অনুবাদ করতে দিলেন। লেখাটি বড়ো কঠিন শব্দে ভরা। আমি আন্তরিক পরিশ্রম করে অনূদিত লেখাটি ভবেন্দুদার হাতে দিলে, তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন! ধন্যবাদের শেষ নেই! সংখ্যাটি শেষকালে বেরিয়ে পাঠকজনের আগ্রহ ও রুচিকে সন্তুষ্ট করল। তিনি দীর্ঘদিন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ভালো কবিতাও লিখতেন। দেখতে দেখতে একদিন ভবেন্দুদার ‘স্বস্তিকা’র সম্পাদনার ইতি হলো। তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটল।

এবার এলেন প্রীতিভাজন শ্রী বিজয় আঢ্য। প্রাণমন দিয়ে পত্রিকা সম্পাদনা করতে লাগলেন! অনেক লেখা ও রেখায় পাঠক মনে এনে দিলেন সুস্থ-ভাবনা-চিন্তার প্রেরণা। পাঠকদের অনেকেই লেখা পাঠিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর সম্পাদনায় ‘স্বস্তিকা’ সুস্থ ভাবনা-চিন্তার একটি বলিষ্ঠ মাধ্যমে পরিণত হয়ে উঠল। ‘ট্যাবলেয়েড’ থেকে ‘বুক-ফর্মে’র আকার নিয়ে অনতিকালে পত্রিকা সকলের কাছে একটি প্রিয় সংবাদ-সাপ্তাহিক রূপে পরিচিত হলো। কিন্তু একটা সময় এল প্রীতিভাজন বিজয়বাবু ‘স্বস্তিকা’র সম্পাদনা থেকে অব্যাহতি নিলেন। কিন্তু ‘স্বস্তিকা’র অগ্রগতির ইতিহাস প্রিয় বিজয় আঢ্য একটি চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেলেন!

‘স্বস্তিকা’র নববর্ষ সংখ্যার ‘উন্মোচন অনুষ্ঠান’ পাঠক, গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী ও পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বশীল মানুষজন ও গুণীলোকেদের এক অপূর্ব সমাবেশ। সকলের এই শুভেচ্ছা ‘স্বস্তিকা’র চলার পথে নিয়ে আসে নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণা। অনুষ্ঠান-স্থল থেকে ফেরার সময় বার বার একটি কথাই মনে আসে--- ‘স্বস্তিকা’ তোমার জয় হোক।

আগেই উল্লেখ করেছি ‘স্বস্তিকা’র নবপর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ‘বুক-ফর্ম’ ও সুদৃশ্য

প্রচ্ছদ। সেই সুন্দর প্রচ্ছদের কয়েকটি উল্লেখ করা সময়োচিত হবে। যেমন ১৮ জানুয়ারি, ২০২১-এর নেতাজী সংখ্যার প্রচ্ছদ 'পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তিলাভের নায়ক, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক— ভারতীয় রাজনীতির 'অভিমন্যু''। ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, '২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২' ভাষা-শহিদ স্মরণে। 'একুশে : ভাষার মাস না হতাশার?' আবার ১ মার্চ, ২০২১ বিজেপির পতাকা চিহ্নিত প্রচ্ছদে বলা হচ্ছে, 'রাজ্যে ক্ষমতা বদল হলেও নতুন শাসককে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।' এভাবে প্রতি সপ্তাহে তৎকালীন ঘটনাকে উল্লেখ করে প্রচ্ছদ, আর ভেতরে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও লেখা। এ ভাবেই 'স্বস্তিকা' এগিয়ে চলেছে। উল্লেখযোগ্য কোনো বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা ও সাহায্য নেই, কোনো প্রশংসাসূচক বাক্য নেই, বরঞ্চ আছে নানা ধরনের বিরূপতা ও বিধ্বংসী মনোভাব, তারই মাঝে 'স্বস্তিকা'র আগমন। আগামীদিনে লেখায় ও রেখায় 'স্বস্তিকা' হয়ে উঠবে আরও সমুজ্জ্বল ও গৌরবময়। প্রতিটি দেশহিতৈষী ভারতবাসী 'স্বস্তিকা'র সেই মহাউত্তরণ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। 'জয়তু স্বস্তিকা'।

রণজিৎ সিংহ,
রাজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লেন,কলকাতা-৩৬।

ভোটরঙ্গ

প্রতিবার ভোট সমাগত হলে কিছু মানুষ (?) চনমনিয়ে ওঠে। সারা বছর পার্টির কোনো কাজে যাদের দেখা যায় না, মানুষের সঙ্গে না মেশা এই লোকগুলো হঠাৎ করে এত বেশি পার্টির সবথেকে কাছের, সবথেকে বিশ্বস্ত, সবথেকে বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে— দেখে, সত্যি বলছি, তাক লেগে যায়। যে মানুষগুলো পার্টির শৃঙ্খলা ও অনুশাসন মেনে নিরলস ভাবে কাজ করে যায়, পার্টির কাজ করতে গিয়ে যে মানুষগুলো খুন হয়, মার খায়, তাদের বা তাদের পরিবারবর্গকে গালিগালাজ বা অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষা হজম করতে হয়, সেই মানুষগুলোর যেন ভোটের সময় কোনো মূল্য নেই! তারা যেন পার্টির জঞ্জাল! আর ভোটপাখিরা তখন অতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, পার্টিতে তাদের গুরুত্ব, তাদের ওজন বোঝাতে। ভোটের সময় আগে সমস্ত ক্ষীরটুকু বেবাক হজম করে এই ভোটপাখিগুলো সাধারণ কর্মীদের দু'চার টাকা দিয়ে পার্টি নেতৃত্বের কাছে এমন একটা ভাব দেখায় যেন, তারা ওই সাধারণ কর্মীগুলোকে উদ্ধার করে দিল!

এই সময়, এই পরিস্থিতিতে, আমার মনে হয় পার্টি নেতৃত্বের উচিত স্বামীজীর সম্পর্কে বাণী আর একবার স্মরণ করা। স্বামীজী বলেছিলেন— কর্মীরা হলো যে কোনো সংগঠনের মূল প্রাণভোমরা। তারাই হলো ওই সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি। তারা অর্থাৎ কর্মীরা আছে বলেই সংগঠন আছে, সংগঠনের বিস্তার আছে। কোনো নেতা কোনো কর্মীকে তৈরি করতে পারে না। কেবল এক বা একাধিক ভালো কর্মী পারে একটা নেতাকে তৈরি করতে, সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনকেও চাঙ্গা রাখতে। ভোটের সময় সেই কর্মীদের বিপদের মুখে ফেলে যে সকল মহান নেতা ঘরে মুখ লুকিয়ে থাকে, তাদের চেনার, তাদের নির্দিষ্ট জায়গা দেখাবার সময় কিন্তু হয়েছে। পার্টি নেতৃত্ব কি আত্মবিশ্লেষণ করবে? অথবা সেইসকল তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী অরাজনৈতিক সংগঠনগুলো। এরা তো আবার অত্যন্ত সচেতনভাবে বিজেপির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে। আবার এরাই ঘরোয়াভাবে বিজেপির ব্যানারে এদের মতামত যে গুরুত্বপূর্ণ— সেটা জাহির করতে, নিজেদের মাতব্বরিটা বিশেষরূপে প্রকাশ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে! আমি সেইসকল অরাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে অতি বিনম্রভাবে জিজ্ঞাসা করছি— হবে নাকি একটু আত্মবিশ্লেষণ? অনেক ধান্দাবাজ আবার একটা বিশেষ অরাজনৈতিক সংগঠনের বিশেষ 'কেউকেটা' হিসেবে বিজিপিতে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে এবং সফলও হয়। একটু সতর্ক হবেন নাকি? নাকি এই বিশেষ 'দিতে আর নিতে', 'মিলিবে আর মিলিবে'-র গোপন চুক্তি চলতেই থাকবে?

—গৌতম চক্রবর্তী,
৭৪/৪/এ, হরিঘোষ স্ট্রিট,
কলকাতা-৬।

সিলেবাস বহির্ভূত আকবর

বর্তমানের শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীর, একাদশ শ্রেণীর ও কলেজ স্তরের পাঠক্রমে মোগল আমলের কথা, আকবরের কথা জানতে পারলেও পাঠ্যসূচি বর্হিভূত আকবরের বহু কথা অজানাই থাকে, তার দু'চারটিই আকবরের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ধারণা বদলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

আকবর ছিলেন নেশাখোর, যিনি আফিং ও মদের আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। চিতোর দুর্গ দখল করে যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে, প্রমাণ হয় সত্যই তার দেহে চেঙ্গিজ খাঁর রক্ত বইছে। গুজরাট বিজয় করতে গিয়ে যে হত্যালীলা, সন্ত্রাস, হিন্দুদের মুণ্ডু কেটে স্তম্ভ নির্মাণ, অর্ধমৃত হেমু ও তার পিতাকে হত্যা করা, কামরানের পুত্রকে গোপনে হত্যা করা, খান জামনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা, হামজবান নামক সেনাপতির জিহ্বা কেটে দেওয়া, দাউদ খান পরাজিত হলে আকবরের সেনাপতি মুনিম খান তাকে ও তার বাহিনীর লোকজনের মাথা কেটে আটটি উঁচু মিনার তৈরি করা ইত্যাদি নিষ্ঠুরতার পরিচয়। আকবরের পাঁচ হাজারি হারেমে কেই-বা নেই, এ হলো লাভজেহাদের গারদখানা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অনেক রাজনন্দিনী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে, আকবরের হারেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। প্রায় তিনশো স্ত্রীর মধ্যে অন্যতম হলো, হিন্দালের কন্যা সুলতানা রুকায়ুহ বেগম, বিহারীমলের কন্যা মরিয়ম উম জমানী, বৈরাম খানের স্ত্রী সেলিমা সুলতানা, সম্রাট শেখ আবুল ওয়রিশের স্ত্রী, আব্দুল খান মোগলের কন্যা, বিকানীরের রাজা কল্যাণ মলের ভাই কাহানের কন্যা, জয়সলমির রাজা রাওল হররাইয়ের কন্যা, দুঙ্গারপুরের রাজকন্যা ইত্যাদি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমরা সাড়ে চুয়াত্তর কথা বলতে শুনেছি, শেষ বয়সে এসে বলেছেন যে, একজন পুরুষের একটি পত্নীই থাকা উচিত, আর যে পরিবারে বহু বিবাহ আছে, সেখানে শান্তি নেই।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর পূর্ব মেদিনীপুর।

স্বয়ংসিদ্ধা নারীশক্তির উন্মেষ লগ্নে

শুক্লা শিকদার

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী শক্তির প্রতীক। নারী ঐশ্বর্যের ধারক ও বাহক। নারী অনুপ্রেরণার সূত্র। বৈচিত্র্যের দেশ, ঐতিহ্যের দেশ ভারতবর্ষে নারী কখনো মাতৃরূপে বন্দিত, কখনো আবার দেবীরূপে পূজিত, কখনো আবার এই দেশই নারীরূপী মাতৃকা। জন্ম থেকেই সন্তানরা যার জন্য নিবেদিতপ্রাণ।

ভারতবর্ষে দেবীরূপে পূজিত হয় নারীর বিভিন্ন রূপ। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে নারী 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। বিদ্যাং দেহি, জয়ং দেহি, ধনং দেহি' বলে স্তুতি করা হয়েছে। নারীর ঐতিহাসিক অবদান গাথাও কম নয় ভারতে। প্রাচীন বৈদিকযুগে যেমন গার্গী, অপালা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী প্রমুখ নারীর অবস্থান ভাস্বর ছিল। ঠিক তেমনি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসেও স্থান করে নিয়েছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো সাহসী নারীরা।

ভারতের নবজাগরণের হোতা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ উপলব্ধি করেছিলেন নারী জাতির উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের উন্নতি কখনওই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণের সংকল্প নিয়ে নারী শিক্ষা ও নারীর অগ্রগতির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনি বা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় নারীর সশক্তিকরণ প্রাধান্য পেয়েছে। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী থেকে লীলা নাগ, মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে কনকলতা বড়ুয়া— নবজাগরণের বাঙ্গলা থেকে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সমাজ গঠনে নারীদের অবদান সর্বজনবিদিত।

তবে ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনির বিপরীতে বাস্তবের মাটিতে ভারতীয় তথা বাঙ্গলার নারীদের আর্থসামাজিক ও সাংসারিক অবস্থান সম্পর্কে আজও সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। সাংসারিক জীবনে নারীদের অবিরাম নিঃস্বার্থ ক্রিয়াশীলতা, মনস্তাত্ত্বিক প্রাধান্য যেন আজও বাস্তবের মাটিতে ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি। ব্যতিক্রমী কিছু নারীকে বাদ দিলে আজও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সবেতন চাকরি, সম্পত্তির অধিকার এই সমস্ত ক্ষেত্রেই নারী তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। আজও সাংসারিক জীবনে অবিরত কাজ করে চলা নারী যেন ভুলেই গেছে যে তারও কিছু চাওয়ার রয়েছে, তারও কিছু আলাদা করার রয়েছে, যে কাজ তাকে আত্মনির্ভর করে তুলবে, অধিকার আদায়ের পন্থা দেবে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেবে, এনে দেবে সম্মান, প্রসিদ্ধি, করে তুলবে আত্মনির্ভর। আর আত্মনির্ভর নারীই হতে পারে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। ছিনিয়ে নিতে পারে নিজের প্রাপ্য। হয়ে উঠতে পারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতায় বলীয়ান। আর পাঁচজন পিছিয়ে পড়া নারীর জন্য হয়ে উঠতে পারে অনুপ্রেরণার ভিত্তি।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণায় এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে নারী স্বাবলম্বী হলে সে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে সন্তানের বিকাশে। তাই নারীর স্বাবলম্বন এককথায় দেশের শিশু তথা দেশের সামগ্রিক বিকাশেরও সোপান।

ভারতবর্ষের মতো ঐতিহ্যশালী দেশ যেখানে নারী বন্দিত হয় মাতৃরূপে, দেবীরূপে। যে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য, সেখানে নারীর স্বাবলম্বন কোনোভাবেই একটি উপেক্ষিত পরিসর হিসেবে থাকতে পারে না। আজকের আধুনিক ভারতের দিকে দিকে উদ্যোগ হয়তো অনেক নেওয়া হয়েছে। অনেক নারী এগিয়ে এসেছেন, সফল হয়েছেন। তবে পরিসংখ্যান বলছে তা যথেষ্ট নয়। আজ ভারতের ৪২ শতাংশ নারী যেখানে কৃষিজ উৎপাদনে শ্রম বিনিয়োগ করেন সেখানে মাত্র ২ শতাংশ ভারতীয় নারী কৃষি জমির মালিকানা ভোগ করেন। চাকরির ক্ষেত্রে আজও ভারতে 'জেন্ডার পে গ্যাপ' ৩৪ শতাংশ অর্থাৎ একই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একজন ভারতীয় নারী কর্মক্ষেত্রে সমযোগ্যতাসম্পন্ন একজন পুরুষের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কম বেতন পেয়ে থাকেন।

ভারতের জনসংখ্যায় প্রায় অর্ধেক নারী হলেও মাত্র এক চতুর্থাংশের কিছু কম সংখ্যক নারী 'লেবার ফোর্সে' অংশগ্রহণ করেন অর্থাৎ সাংসারিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শ্রম দান করলেও নারীদের শ্রমের মাত্র এক চতুর্থাংশেরও কম অংশ ভারতের জিডিপিতে প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে ভারতের চরম অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও বাজারে শ্রম বিনিয়োগে নারীদের অত্যন্ত কম অংশগ্রহণ দেখে এটা মনে হয় যেন ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্জীবিত হওয়ার জন্য তার নারীশক্তিকে ভুলেই গেছে। ভারতের নারীশক্তিকে এবং নারীদের সঠিক মূল্যায়ন ও প্রয়োগ ছাড়াই ভারত অত্যন্ত ধীর ও মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছে। চিত্রটা একটু অন্যরকম হতে পারত, নারী শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এগোলে, ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রতি বছরে ১.৫ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারত যদি ভারতের শুধুমাত্র ৫০ শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেক নারীশক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রম বিনিয়োগ করত। তবে সমাধান কোথায়? এবং তার ভিত্তিই-বা কী?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ফিরে যেতে হবে ১৯৭১ সালে। কারণ ভারতে ১৯২১ সালে গান্ধীজী সেবাগ্রাম প্রকল্পের সময় সেলফ হেলফ গ্রুপের ধারণা দিয়েছিলেন। বর্তমানে নারীদের ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা গ্রুপে স্বাবলম্বী ও উপার্জনক্ষম করে তুলতে সেলফ হেল্প গ্রুপ অন্যান্য অনেক পন্থার পাশাপাশি একটি নির্ভরযোগ্য পন্থা। ভারতে সেলফ হেল্প গ্রুপের পথপদর্শক সমবায় হলো 'সেলফ এমপ্লয়েড ওমেন'স অ্যাসোসিয়েশন (বেবা)'। ১৯৭০ সালে গুজরাটের আমেদাবাদের ইলা বেন 'সেবা' সমবায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নারীদের সঙ্গে মাইক্রোফিনান্সের সংযোগ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে 'সেবা'-র গ্রামীণ মডেলের প্রকাশ ঘটে। □

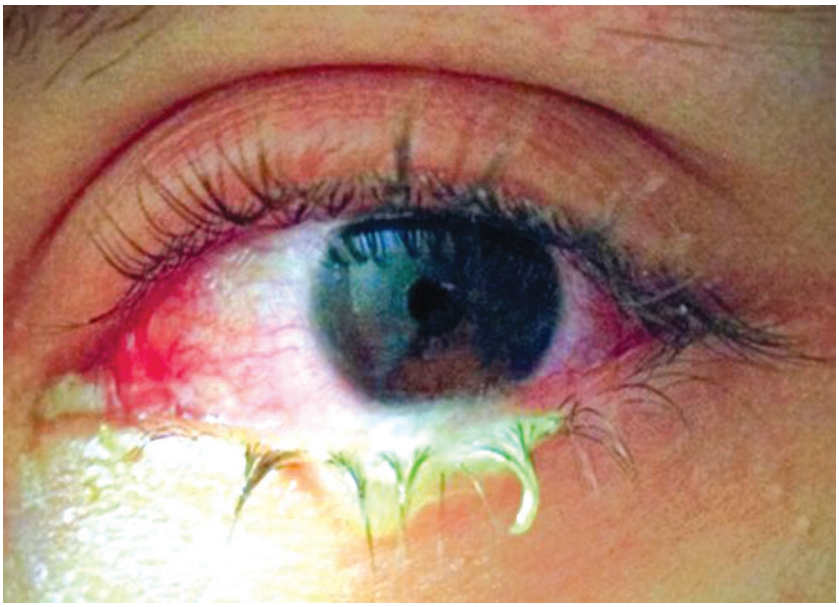

কনজাংটিভাইটিসও কোভিড-১৯-এর উপসর্গ হতে পারে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সম্প্রতি করোনার নতুন স্ট্রেন সমগ্র দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এতদিন আমরা ডাবল মিউটেশন কথাটি শুনে এসেছি, সদ্য দিনদুয়েক ট্রিপল মিউটেশন কথাটি শুনেছি। এর অর্থ হলো করোনা ভাইরাস একটা জিনের পরিকাঠামোয় তিন জায়গায় তার ধরন বদল করছে। এর ফলে করোনার নানা নিত্যনতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো কনজাংটিভাইটিস বা পিংক আইয়ের সমস্যা। অপেক্ষাকৃত কম বয়সি লোকজন কিংবা বাচ্চাদের মধ্যে এই সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করছে।

এতদিন মুখ ও নাক সম্পর্কে আমরা জানতাম নাকের থেকে বা থুতুর ড্রপলেট থেকে করোনা ভাইরাস ছড়ায়। নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে চোখ থেকেও তা হতে পারে। কোনও করোনা রোগীর কনজাংটিভাইটিস হলে সে চোখে হাত দিলে সেই হাত অন্যত্র রাখলেই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়বে, কেননা করোনা অসম্ভব ছোঁয়াচে ভাইরাস।

দ্য কানাডিয়ান জার্নাল অব অপথালমোলজিতে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, কনজাংটিভাইটিস ও কেটোকনজাংটিভাইটিসের মতো রোগও করোনার উপসর্গ হতে পারে, জ্বর, শুষ্ক কাশি, ক্লান্তি, পেশিতে ব্যথা, গলাব্যথা, মাথাব্যথা, স্বাদ ও গন্ধর অনুভূতি চলে যাওয়ার মতো উপসর্গগুলির পাশাপাশি।

বর্তমানে চিকিৎসকদের হাতে যে তথ্য আছে তা জানাচ্ছে করোনা রোগীদের মাত্র ৩ শতাংশের কনজাংটিভাইটিস হচ্ছে। চোখের মধ্যে কনজাংটিভা বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে, যা আমাদের চোখের সাদা অংশটিকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

যখন ভাইরাস কনজাংটিভার টিস্যুগুলিকে আক্রমণ করে তখনই হয় কনজাংটিভাইটিস। অন্য ভাইরাসের মতো কোভিডও একটি ভাইরাস, ফলে সেটি কনজাংটিভাকে আক্রমণ করতেই পারে। এর ফলে চোখ লাল হয়ে জায়গাটায় চুলকানি হতে থাকে। চোখ ফুলে, চোখ থেকে ক্রমাগত জল পড়তে থাকে। গবেষণায় বলছে, কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে ১০-১৫ শতাংশ কেসে উপসর্গ হিসেবে কনজাংটিভাইটিস আছে দেখা গেছে।

তবে সবচেয়ে অসুবিধাজনক ব্যপার হলো কোভিডের প্রাথমিক পর্যায়ে কনজাংটিভাইটিস বা এর থেকে হওয়া পিংক আই (চোখে ভাইরাল সংক্রমণ হয়ে লালচে বা গোলাপি হয়ে যাওয়াকেই চিকিৎসার ভাষায় বলা হচ্ছে পিংক আই) থাকে না। যখন কোভিড অ্যাডভান্স পর্যায়ে পৌঁছে যায়, রোগীর প্রবল শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, তখন এই উপসর্গগুলি আচমকা প্রকাশ পায়। এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে সঠিক রোগ নির্ণয়ে আরটিপিসিআর পরীক্ষা করানো জরুরি।

তবে কারও চোখ লালচে হয়েছে, কিংবা চোখ ফুলে গেছে মানেই যে তার কোভিড-১৯ শরীরে বাসা বেঁধেছে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তবে বর্তমানে কোভিডের যা বাড়বাড়ন্ত, তাতে চোখে কোনওরকম অস্বস্তি দেখা দিলে তাকে অবহেলা করা উচিত নয় বলেই চিকিৎসকরা বারে বারে পরামর্শ দিচ্ছেন।

প্যানডেমিকের সময়ে চোখকে নিরাপদ রাখার কয়েকটি প্রয়োজনীয় টিপস :

কোনও জায়গা যেখানে প্রচুর লোকজনের আনাগোনা বা জনসমাগম বেশি, সেইসব জায়গায় যাওয়া যতটা পারবেন এড়িয়ে চলুন। সবসময়ে মাস্ক পরে থাকুন। তিন লেয়ারযুক্ত মাস্ক দরকার। প্রয়োজনে ডাবল মাস্ক পরুন। চোখে ব্যবহার করুন গগলস বা চশমা।

কোথাও গেলে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে খুব বেশি নিকট অবস্থানে দাঁড়াবেন না, নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।

বারে বারে হাত ধোবেন, সাবার দিয়ে কুড়ি সেকেন্ড রগড়ে, তারপর চোখে জলের ঝাপটা দিন। বাইরে থেকে এসে নোংরা হাতে চোখ ধোবেন না। বাইরে বের হলে চোখ চুলকোলে বা চোখ মোছার প্রয়োজন হলে পরিষ্কার শুষ্ক টিস্যু ব্যবহার করুন। বার বার চোখ ঘষা ও মুখ স্পর্শ করার অভ্যাস থাকলে সেটাকে বর্জন করুন।

গগলস বা চশমা যদি নাও পরতে চান নিদেনপক্ষে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করুন ও এর জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে বের হোন।

করোনা বিধিনিষেধের অস্ত্রে বিরোধীদের ঘায়েল করার উদ্দেশ্যেই কি রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি খোলার উদ্যোগ নেই?

সাধন কুমার পাল

দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্কুলগুলি কেমন ভাবে চলছে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত রিপোর্ট (২০১৭-১৮) বলছে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষামান ও ফলাফল এবং পরিকাঠামোয় পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঁয়ত্রিশে। সিকিমেরও পিছনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, মাতৃভাষা, অঙ্ক ও বিজ্ঞানের মূল্যায়নে বিহার, ওড়িশা, অসম, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে আছে অনেক পিছনে। করোনা মহামারির জেরে বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় খোলার ব্যাপারে দেশজুড়ে যে তৎপরতা শুরু হয়েছে তাতেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান শেষের দিকে। প্রায় দেড় বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ। করোনার প্রথম ঢেউয়ের পর সংক্রমণ কমে এলে কিছুদিনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুললেও দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় আবার বন্ধ হয়ে যায়। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর আবার সংক্রমণ কমতে শুরু করলে গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মতো বিভিন্ন রাজ্য স্কুল

রাজ্যে সংক্রমণের হার দুই শতাংশ দেখিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে কোনোরকম তৎপরতা দেখানো হচ্ছে না, অথচ উপনির্বাচনের দাবি তোলা হচ্ছে।

খোলার ব্যাপারে তোড় জোড় শুরু করলেও এই লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কোনোরকম তোড়জোড় নেই। এরাজ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি খোলার ব্যাপারে কোনোরকম তৎপরতা না থাকলেও ছ'মাসের মধ্যে উপনির্বাচন করানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সরকার তথা শাসকদল।

হিমাচল প্রদেশে করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ার পরে গত ১১ জুন মেডিক্যাল, আয়ুর্বেদিক, ডেন্টাল, নার্সিং ও ফার্মাসি কলেজগুলি পুনরায় চালু করার ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক রাজ্যে করোনার প্রোটোকল অনুসরণ করে পর্যায়ক্রমে স্কুলগুলি পুনরায় চালু করার এবং শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছার ভিত্তিতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবছে। পড়ুয়াদের স্কুল ও কলেজগুলিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রায় সমস্ত রাজ্য একটি লিখিত সম্মতি প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

করোনার সংক্রমণ কমে আসায় ভারতের গুজরাট ও হরিয়ানায় স্কুল খুলছে। পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলবে দুই রাজ্য। এর আগে বিহারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার কথা জানানো হয়। হরিয়ানার শিক্ষামন্ত্রী কানওয়ারলাল গুর্জর রাজ্যে শর্তসাপেক্ষে স্কুল খোলার কথা জানান। তিনি জানিয়েছেন, প্রথমে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল খুলবে। ১৬ জুলাই থেকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাসে পড়া শুরু হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্কুলগুলোতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে অন্য শ্রেণীরও ক্লাস শুরু হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার বলেছেন, সংক্রমণের হার কমে আসায় ধীরে ধীরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গুজরাটেও খুলতে যাচ্ছে স্কুল। ওই রাজ্যের শুধু দ্বাদশ শ্রেণী পড়ুয়াদের জন্য। গুজরাটে ১৫ জুলাই থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য

স্কুল খুলবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। তবে দ্বাদশের ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী ক্লাসে বসার অনুমতি পাবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, রাজ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ুয়াদের জন্য কলেজ খুলবে ১৫ জুলাই থেকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে ৫০ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্কুল ও কলেজে আসার বিষয়টি নির্ভর করবে শিক্ষার্থীদের ওপর। উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না। হরিয়ানা ও গুজরাট দুটি রাজ্যেই এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ব্যবহার, স্যানিটাইজেশনের মতো করোনা বিধি পালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিহারে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শুরুর কথা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ খুলবে। ৫০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অফলাইন ক্লাস শুরু হবে। শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মী, শিক্ষক, ছাত্রদের টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

করোনাকাল পেরিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ফের স্কুলমুখি করার জন্য পড়ুয়া পিছু ২ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা করার কথা ভাবছে কর্ণাটক সরকার। স্কুলে যাওয়ার পেছনে পড়ুয়া কিংবা তাদের অভিভাবকদের কোনো ধরনের ভীতি যেন কাজ না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই স্কুল পড়ুয়াদের উৎসাহ ও সাহস যোগাতেই এধরনের ভাবনা বলেই জানা যাচ্ছে। যদিও এখন অবধি এটি একটি কমিটির সুপারিশ স্তরেই রয়েছে তবুও বিষয়টিকে মেনে নিতে চলেছে কর্ণাটক সরকার এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, মনে করা হচ্ছে আগামীদিনে এই পথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিও হাঁটতে পারে। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। শুধু তাই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে। এসব কথা মনে করেই বহু রাজ্য স্কুল খোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। একদিকে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিদায় অন্যদিকে তৃতীয় ঢেউয়ের হুঁশিয়ারি— এরই মধ্যে চলছে দেশের একাধিক রাজ্যে স্কুল খোলার তোড়জোড়। এ ব্যাপারে যে কয়েকটি রাজ্যে তৎপরতা তুঙ্গে তার মধ্যে রয়েছে কর্ণাটক। করোনা পরিস্থিতিতে কীভাবে স্কুল চালু করা যায় তা নিয়ে অনেকটাই আলোচনা হয়ে গিয়েছে কর্ণাটক সরকারের। স্কুল খোলার বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করেছে কর্ণাটক সরকার। যে কমিটির মাথায় রয়েছেন বিখ্যাত হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেবী শেঠি।

করোনা পরিস্থিতিতে কীভাবে সংক্রমণ এড়িয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপদে থাকতে পারে তা নিয়ে পর্যালোচনা করছেন বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যরা। ডাঃ শেঠির নেতৃত্বাধীন ওই কমিটি স্কুল খোলা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে একটি সুপারিশ জমা দিয়েছে। স্কুলের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য দু' লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার সুপারিশ করেছে কমিটি। এ প্রসঙ্গে কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে স্কুলে যেতে উৎসাহ বোধ করেন এবং তাদের অভিভাবকরাও যাতে তাদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হন সে ব্যাপারে তৎপরতা নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দু' লক্ষ টাকার বিমার ব্যবস্থা করা হবে। এমন তৎপরতায় ইতিমধ্যেই বিশ্বের বহু দেশ নিয়েছে। কর্ণাটক সরকারের আশঙ্কা করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি সেখানেও বহু শিশু আক্রান্ত হতে পারে। তবে রাজ্যে স্কুল খোলা নিয়ে তৎপরতায় আরও বেশি সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। তাদের বক্তব্য, সংক্রমণ কিছুটা কমলেও তা নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। বরং এবার আরও বেশি সাবধান হতে হবে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত তৎপর হতে হবে কর্তৃপক্ষকে। স্কুলে নিয়মিত পঠন পাঠনের পাশাপাশি ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্কুল খোলা নিয়ে সরকারি স্তরে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কমিটির সদস্যদের আশঙ্কা, এভাবে দিনের পর দিন স্কুল বন্ধ থাকলে বিপদ বাড়বে। একদিকে গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন অপুষ্টির শিকার হবে তেমনি শিশু শ্রমিক ও বাল্যবিবাহের মতো বিপদ মাথাচাড়া দেবে। সুতরাং সব ধরনের সতর্কতা নিয়ে অবিলম্বে স্কুল চালু করার তৎপরতা শুরু হয়েছে কর্ণাটকে। সেই সতর্কতার পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য এই স্বাস্থ্যবিমা অনেকটাই উৎসাহ জোগাবে পড়ুয়াদের স্কুলমুখি হতে।

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের বিষয়টিও মাথায় রাখা হচ্ছে। প্রথম দিকে বলা হচ্ছিল শীতে কিংবা পূজার পরে আসতে পারে এই ঢেউ। কিন্তু ইদানীং বিশেষজ্ঞদের অনেকে বলছেন আগামী ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষ থেকে আগস্টের মধ্যে তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে। সেদিকে নজর দিয়ে রাজ্যগুলির প্রতি সুনির্দিষ্ট পরামর্শ রাখতে পারে কেন্দ্র।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে না আসার সরকারি বিধি নিষেধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মিডডে মিলের সামগ্রিক বিতরণ, অ্যাক্টিভিটি টাস্ক বিতরণ ও উত্তরপত্র জমা নেওয়া, একাদশ শ্রেণীর ভর্তি ঘিরে স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অসহায়। বেশি কড়াকড়ি করতে গেলে স্থানীয়ভাবে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে। এই ভিড়ের জন্য করোনা সংক্রমণ বাড়ছে এমন কথা কেউ বলছে না। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, বাজার, ঘাট, শপিংমল, লোকাল বাস সবই তো খোলা। নির্বাচন হচ্ছে, লোকসভা, বিধান সভার অধিবেশনও হচ্ছে নিয়মিত। শুধু স্কুলবন্ধ কেন? মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা না নেওয়ার জন্যও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও প্রবেশিকা পরীক্ষা না নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের ফতোয়া মানুষ ভালো ভাবে নিচ্ছে না। কারণ এতে ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষা থেকে শুরু করে চাকুরি পাওয়া পর্যন্ত মেধাকে অগ্রাহ্য করার এই প্রবণতা যে এই রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ রাজ্যে একদিকে সংক্রমণের হার দুই শতাংশ দেখিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে কোনোরকম তৎপরতা না দেখিয়ে উপনির্বাচনের দাবি তোলা হচ্ছে। করোনা বিধিনিষেধের সময়সীমা জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই সরকারের অগ্রাধিকার ও করোনা মহামারীর সময় নানা সিদ্ধান্তের পরস্পর বিরোধিতার জেরে রাজ্যের মানুষও কার্যত দিশেহারা।

স্কুলগুলি পুনরায় চালু করার বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিস্তৃত নির্দেশিকা অনুসারে জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিস্থিতি অনুসারে নির্দেশিকা কার্যকর করতে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে। সরকারি ব্যবস্থার অধীনে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে মানক অপারেটিং প্রোটোকল অনুসরণ করার কোনও বাধা নেই বলে গ্রামীণ অঞ্চল, ছোটো শহর এবং বড়ো শহরগুলির সমস্ত সরকারি ও সহায়ক স্কুলগুলি চালু করা উচিত। পাঠ্যক্রম কমিয়ে আনা প্রয়োজন। কারণ স্কুল পুনরায় খোলার লক্ষ্য মূলত স্কুল সংযোগ, মনো-সামাজিক সুস্বাস্থ্য এবং বাচ্চাদের স্ট্রেস-মুক্ত শিক্ষার জন্য। ▯

অতিমারীতে রাজ্যের শিক্ষা চলে গেল ভেন্টিলেটরে

বিশ্বপ্রিয় দাস

এখনও কাটেনি অতিমারী সংকট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হলেও একটি ক্ষেত্র কিন্তু এখনও সেই অন্ধকারে। কবে খুলবে রাজ্যের সব বিদ্যালয়, কবেই-বা চালু হবে পঠনপাঠন, কবেই-বা হাসি ফুটবে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে, সেকথা এখনও অনেকটা বিশ বাঁও জলে।

এর মাঝেই শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি হলো ২০২১-এ। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের প্রথম মাইল স্টোন পেরনোর পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হলো। ইতিহাস তৈরি হলো পাশের হারে। ১০০ শতাংশ পাশ। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে নতুন একটি রেকর্ড হলো, যা কি না আগামী ১০০০ বছরেও ভাঙবে না। সেটি এই পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীর সংখ্যায়। সর্বোচ্চ নম্বর ৬৯৭ পেয়েছেন ৭৯ জন পড়ুয়া। এবার মাধ্যমিকে ছাত্র পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪,৬৫,৮৫০। অন্যদিকে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬,১৩,৮৪৯। সবাইকেই পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার। গত বছর মাধ্যমিকে পাশের হার ছিল ৮৬.৩৪ শতাংশ।

গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার মাঝেই দেশে করোনার কারণে লকডাউন হয়েছিল। তবে এবার দ্বিতীয় ওয়েভের ধাক্কায় বাতিল হয়ে যায় মাধ্যমিক পরীক্ষা। ছাত্র-ছাত্রীদের বছর যাতে কোনওভাবে নষ্ট না হয় সেই কথা মাথায় রেখে বিশেষ পদ্ধতিতে মূল্যায়নের পর রেজাল্ট প্রকাশ করেছে পর্ষদ। পরীক্ষার্থীদের বিগত পরীক্ষার মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবারের ফল প্রকাশ করেছে পর্ষদ। এবার আসা যাক এই শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে এই সরকারের ছিনিমিনি খেলার বিষয়টি। এই মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে যারা ভালো ফলাফলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাদের যে এই প্রহসনের মধ্যে পড়তে হবে, সেটা তাঁরা কল্পনাতেও আনতে পারেননি। একটি সরকারি ভাঁওতার শিকার হয়েছে সেই সব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী যারা নিজের পরিশ্রমে একটু ভালো ফলাফলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল হবার কথা ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন মেধাবী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনা রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাতে আর কী এসে যায় রাজ্যের প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের। তাঁদের কাছে নাকি প্রায় ৮৬ হাজার পরিক্ষার্থীর অভিভাবকরা পরীক্ষা না চেয়ে মেল করেছে। এমনটাই তো মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন। এই যে হাজার হাজার অভিভাবক রাজ্য সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে পরীক্ষা না নেবার আবেদন করলেন, তাঁদের মধ্যে কতজন প্রকৃত অভিভাবক ছিলেন, সেটা কিন্তু জানা যায়নি। যাই হোক, রাজ্য সরকার বাতিল করল পরীক্ষা। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে, যেখানে ওপেন বুকে অন লাইনে বিভিন্ন পরীক্ষা হলো, সেখানে কী কোনো ভাবে নেওয়া যেত না এই পরীক্ষা? তাহলে এভাবে প্রহসন করে ফলাফল বের করবার মানেটা কী? আর একটি প্রসঙ্গ আসে, এখানেও ইতিহাস রচয়িতা রাজ্য সরকার। কোনো অ্যাডমিট কার্ড থাকবে না পাশ করা পরীক্ষার্থীর হাতে। আমরা যারা এখনও কোথাও বয়েসের প্রমাণপত্র দাখিল করি, তাঁদের কাছে একমাত্র প্রমাণপত্র হিসেবে ওই জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষার প্রবেশপত্রটাই আসল হিসেবে দেখা দেয়। সেটা আর পেল না ছাত্র-ছাত্রীরা। ওটি অবশ্য পেল, রেজাল্টের সঙ্গে। কিন্তু জীবন থেকে মুছে গেল প্রথম বড়ো পরীক্ষার বিষয়টি। আসা যাক পরীক্ষা পরবর্তী ভর্তির কথায়। এবার একাদশ শ্রেণীতে পছন্দের

বিষয় নিয়ে ভর্তি। এত সংখ্যক (৯০ শতাংশ) প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী, অনেকেই হয়তো বিজ্ঞানকে পছন্দের বিষয় হিসেবে ভাববে। তাঁদের জন্য কি এত সংখ্যক আসন বা পরিকাঠামো আছে? তর্কের খতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় আছে, তাহলে কি সেই পরিমাণ শিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন তাদের শিক্ষা দেবার জন্য? এই প্রশ্ন তোলা অবশ্য ঠিক নয়। আর ১০০ শতাংশ পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রাজ্যে যত উচ্চ মাধ্যমিকের আসন আছে, পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়ার জন্য সেখানে সংকুলান হবে তো?

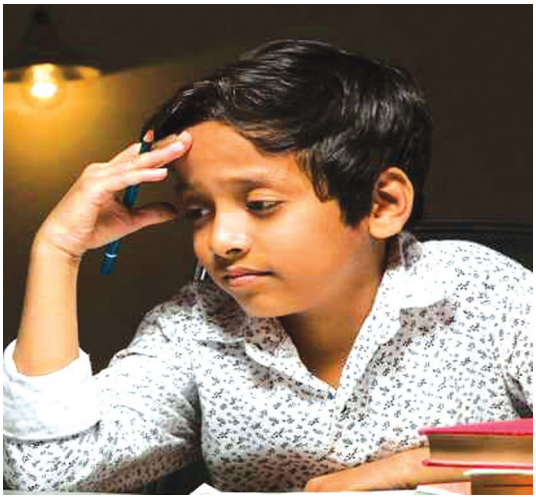

রাজ্যে এখন চলছে কার্যত লকডাউন। সেখানে সব কিছু অস্বাভাবিক না হলেও কিছুটা স্বাভাবিক ভাবেই খোলা। অফিস থেকে শপিং মল, মদের দোকান থেকে বাজার, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ছাড় দিয়ে খুলে রাখার চেষ্টা হয়েছে। একমাত্র খোলেনি রাজ্যের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও রাজ্যের একটি স্বশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেদের মতো করে পঠনপাঠন চালিয়ে গেছে। কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় একটিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজও তাঁদের দরজা খোলেনি। কারণ অতিমারীর ভয়। একটা প্রশ্ন প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা জানেন কি, এই সময়ে আপনার বাড়ির যিনি পরিচারিকার কাজ করেন, তিনি কিন্তু নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন আপনার বাড়িতে অথবা অন্য বাড়িতে। তিনি কি আপনার বাড়ি থেকে বা অন্যের বাড়ি থেকে সংক্রমিত হবেন না বা হতে পারেন না? তিনি নিজেই বাহক হয়ে আপনার বা আমার বাড়ি থেকে নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন সংক্রামণ ভাইরাস তার নিশ্চয়তা কোথায়? এই অতিমারীর ঢেউ দ্বিতীয় থেকে এবার তৃতীয়তে যাচ্ছে। সহজে কি শেষ হবে এই সংক্রামক ব্যাধির গতিপ্রকৃতি? যদি উত্তর না হয়, তাহলে কি আদি অনন্তকাল ধরে বন্ধ হয়ে থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান? এই প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে আপামর ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে।

বিকল্প একটি পদ্ধতির পঠনপাঠন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এই সংক্রমণের কালে। যার পোশাকি নাম 'অনলাইন' শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারেই বলা যায় প্রায় শেষ করে দিয়েছে। বিশেষ করে সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখন শুধু মিড-ডে মিলের মধ্যেই আটকে গেছে। শহর কলকাতার একটি বহু পুরোনো বিদ্যালয়ের ফুটপাথের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এটি একেবারে বাস্তব। আরও সুবিধার জন্য একেবারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যাক, দক্ষিণ কলকাতার চিত্র এটি। আশপাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ত বহু ছাত্র-ছাত্রী। বিদ্যালয়ের লাগোয়া ফুটপাথেই অনেকের বাস ছিল, এমনকী অন্য রাস্তার পাশে, আশপাশের বস্তিতেও কয়েকশো শিশু আছে, যাদের আনন্দের ঝুড়ি ভরে যেত ওই বিদ্যালয়ের আঙিনায়। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া তাঁদের কাছে ছিল অভ্যাসের মতো। ফুটপাথের বা বস্তির ধুলো মাখা শরীরটাকে চেনাই যেত না বিদ্যালয়ের পোশাকের আড়ালে। গত দু'বছরে চিত্রটা একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল। দক্ষিণ কলকাতার মন্দিরে মন্দিরে ধুলো মাখা কচি হাতগুলো এখন ভিক্ষা করছে। আবার ছোট্ট শরীর পেটের জ্বালায় খুঁজে নিয়েছে কোনো পাতাখোরের সঙ্গে নতুন ঠিকানা। কোনো নাবালিকা অতিমারীর মধ্যেই আনবে হয়তো একটি নতুন প্রজন্মকে। স্কুল ছুটের সংখ্যা কত হবে এই মুহূর্তে বলা শক্ত। কিন্তু স্কুল ছুটের সংখ্যা যে বাড়বে সেটা বলে দেওয়াই যায়।

স্কুলের শিক্ষকরা কত ছাত্র দরদি, সেটা প্রশাসন খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। যদি তাঁদের কোনো ভাবে বিদ্যালয়ে রোস্টার করে আসতে বলা হয়, তাহলে তাঁরা নানা অজুহাতে না আসাটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন এই সময়ে। তাঁদের খারাপ লাগে না বসে বসে বেতন নিতে। ভবিষ্যতের নাগরিক গড়ার কারিগরা যে ভাঁওতা দিচ্ছেন সরকারি ছত্রছায়ায়, সেটা একটু হলেও কি তাদের মানবিকতাকে আঘাত করে না? কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁরা নাকি অন লাইনে ক্লাস নেন। সাধু উদ্যোগ। একজনকে যখন প্রশ্ন করা হলো, আপনার ওইসব গরিব ছাত্র-ছাত্রীর কাছে মোবাইল আছে? আছে তাঁদের কাছে নিয়মিত বেশি পয়সা দিয়ে ইন্টারনেট ভরার সামর্থ্য? তিনি উত্তর দেন, সে আমার জেনে কী হবে। আমি আমার কাজ করছি। একটা দায়সারা বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ হলো সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা জগতে। ছাত্র ও শিক্ষক দুজনেই দুজনকে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি করায়ত্ত করে ফেলেছে এই অতিমারীতে। আদতে ক্ষতি হলো ছাত্র-ছাত্রীদের। করোনা-কালে এটাই শিক্ষা জগতের বড়ো পাওনা।

মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্র-ছাত্রীদের কী সর্বনাশ যে হলো, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন অভিভাবকরা। কেননা, বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতিতে একদিকে যেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা নেই সেখানে দূরভাষে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টা একেবারে নেই। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত সেইসব পরিবার, যারা সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে বড়ো হবার স্বপ্ন দেখেয় তাঁরা মোবাইল বা ইন্টারনেট নেবার ক্ষমতা না থাকায় পড়াশোনা থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে। ফলে শিক্ষা জগতে একটা কালো মেঘের ছায়া যে পড়েছে, সেটা অতিবড়ো শিক্ষাবিদও বুঝতে পারছেন।

গত দেড় বছর ধরে একেবারেই বন্ধ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে এখন শুধু মাসে একবার সম্পর্ক মিড-ডে মিলের সময়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আসেন ওই দিনগুলিতেই। পড়ুয়াদের খোঁজ খবর ওই একবারই নেন শিক্ষকরা। বাকিটা তোলা থাকে পরের মাসের জন্য। গ্রাম থেকে শহরে দেখা গেছে, মাসে মাত্র একবার আসেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সহকারি হিসেবে হয়তো একজন শিক্ষক। এ ব্যাপারেও আছে আসা না আসার মতের পার্থক্য। প্রধান শিক্ষককে হাতে পায়ে ধরে আনতে হয় সহকারীকে। এ চিত্র বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের। এই যদি ছবি হয় সামান্য একদিন আসার বিষয়ে, তাহলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সেটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে না।

আমরা এটাকে বলতে পারি শিক্ষাঙ্গনে করোনার সংক্রমণ। যেটা শিক্ষার ফুসফুসটাকেই দেড় বছরে অকেজো করে দিল। রাজ্যের সমগ্র শিক্ষাই এখন চলে গেছে ভেন্টিলেটরে।

করোনা মহামারী শিক্ষাজগতেও থাবা বসিয়েছে

অনামিকা দে

করোনা নামক তিন অক্ষরের দুষ্ট দৈত্যের জাদুকাঠির ছোঁয়ায় গোটা বিশ্বের পড়ুয়াদের জীবন আজ চার দেওয়ালের মাঝখানে বন্দি । করোনা বা কোভিড-১৯ তার হিংস্র থাবায় ইতিমধ্যেই গ্রাস করে ফেলেছে পৃথিবীময় কয়েক লক্ষ মানুষকে। শুধু যে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তা তো নয়, পালটে দিয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। প্রকৃতি কিন্তু মানুষের ওপর রুষ্ট নয়, ঠিক সময় মতো সূর্যোদয় সূর্যাস্ত হচ্ছে, গাছের ডালে বসে পাখি গান গাইছে, জঙ্গলের পশুরাও প্রকৃতির নিয়মে সাবলীল। কিন্তু সাবলীলতায় বাধ সেধেছে শুধু মানুষ, মানুষেরই জন্যে। মানুষেরই সৃষ্ট মারণ ভাইরাস আজ মানুষকেই এক অচেনা পৃথিবীর সম্মুখীন করেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই জীবনের ছন্দ হারিয়ে এখন চার দেওয়ালে বন্দি। মানুষের নিঃশ্বাসেই এখন বিষ, তাই স্লোগান উঠেছে– 'দূরত্ব বজায় রাখুন, মাস্ক পরুন'।

২০২০-র মার্চ মাস। করোনা সতর্কতায় হঠাৎ করেই লকডাউন। সরকারি, বেসরকারি সব স্কুলই বন্ধ হয়ে গেল। যেদিন ছুটি ঘোষণা হলো পড়ুয়ারা কেউ জানতোই না যে বন্ধুদের সঙ্গে বা স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ থাকবে। তারা জানতোই না যে করোনা দৈত্য গ্রাস করে নেবে তার স্কুলজীবনের প্রাণোচ্ছল দিনগুলো। স্কুলের শ্রেণীকক্ষ এক নিমেষে বন্দি হয়ে যাবে ২১ ইঞ্চির কম্পিউটার স্ক্রিনে বা ৬ ইঞ্চির মোবাইল ফোনে।

স্কুলের পরিবেশ একটি শিশুর বেড়ে ওঠার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মানসিক ও শারীরিক বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করে স্কুলের ওপরে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে 'অনলাইন ক্লাস' এই নতুন পদ্ধতিটি অন্তত পড়াশুনার জগৎটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ঘরবন্দি সময়ে অন্তত পড়ুয়াদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা বা পাঠক্রম অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিক লেখাপড়া চলছে। যদিও এর বেশ কয়েকটি অসুবিধাও রয়েছে, শিক্ষাগত ও স্বাস্থ্যগত।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে পড়ুয়াদের যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় হয়

ঘরে বসে বাচ্চাদের একাকিত্ব ও হতাশা বাড়ছে

করোনা সতর্কতায় অনলাইন শিক্ষা খুবই ভালো। এই শিক্ষা আমাদের কাছে আনন্দদায়ক ও সুবিধাজনক। কারণ নিজের পছন্দমতো জায়গায় যাতায়াতের সময় বাঁচিয়ে, খরচ বাঁচিয়ে যে কোনো জায়গা থেকে ক্লাস করা যায় এবং ভারী ব্যাগ বইতে হয় না। যদিও আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষার পরিপূরক কখনোই অনলাইন হতে পারে না।

শিক্ষার যে সার্বিক লক্ষ্য, শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মুখোমুখী জীবন শিক্ষা, সামাজিকতা, দলগত শিক্ষা, প্রতিযোগী মানিসকতা, অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলার শিক্ষা, পরস্পরের থেকে শিক্ষা, আচরণ ও ব্যবহার শিক্ষা— যা অনলাইনে কখনোই সম্ভব নয়।

আবার অনলাইনে বেশিক্ষণ ক্লাস করলে চোখের সমস্যা, পিঠে ব্যথা বা মাথা ব্যথা হতে পারে। ঘরে বসে একাকিত্ব, একঘেয়েমি ও হতাশা বাড়ছে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস সম্ভব হচ্ছে না। বাচ্চাদের শিখতে সমস্যা, বিষয় শিক্ষাও ভারী হচ্ছে। একথা এনসিইআরটি-র সমীক্ষা বলছে। শিক্ষকরা বুঝতে পারেন না। শিক্ষার্থী আদৌ বিষয় বুঝতে পারছে কিনা।

(অঞ্জনা পায়ড়া, স্কুল শিক্ষিকা)

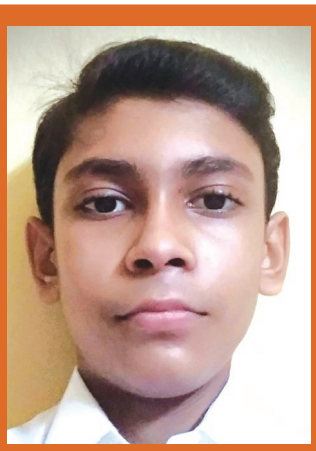

স্কুল খুলে গেলে আমাদের সুবিধা হবে

বিগত দেড় বছর ধরে স্কুল বন্ধ। পড়াশোনাও আগের মতো ঠিকঠাক হচ্ছে না। আগে স্কুল গিয়ে ক্লাস করতে হতো কিন্তু এখন বাড়িতে বসেই অনলাইন ভিডিয়ো ক্লাস করতে হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে ভিডিয়ো ক্লাস করতে করতে চোখের সমস্যা হচ্ছে। বাড়িতে বসে একটানা অনলাইন ক্লাস করতে করতে এখন আমি বিরক্ত হচ্ছি। এরকম সময়ে স্কুল খোলাও ভালো আবার না খোলাও ভালো। স্কুল খুললে আমাদের সুবিধা হয়। ক্লাসে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে তার সঙ্গে সঙ্গে করা যায়। স্কুলে সময় ভালোভাবে কাটে। বাড়িতে থাকলে তা হয় না। স্কুলে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সূচি অনুসারে একটির পর একটি ক্লাস হয়। বর্তমানে তা হারিয়ে গেছে। সেভাবে ভাবলে স্কুল খুলে দিলেই ভালো হয়, কিন্তু বর্তমানে যেভাবে করোনার প্রকোপ বাড়ছে স্কুল খুললে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়বে। সেদিক দিয়ে ভাবলে ভ্যাক্সিনেশন না হলে স্কুল খোলা উচিত নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ছাত্র সংখ্যায় মাস্ক, স্যানিটাইজার, দূরত্ব ইত্যাদি করোনা বিধি মেনে প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্য স্কুল খোলা উচিত। আশা করছি শীঘ্রই আবার আগের মতো হয়ে উঠবে এবং সব স্কুল, কলেজ অফিস আবার আগের মতো খুলে যাবে।

(সুপ্রতীক পাল, অষ্টম শ্রেণী, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার)

এতে পড়ার বিষয়টির প্রায় অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলেই শিখে নেয়। আধুনিক ক্লাসগুলিতে অডিয়ো ভিসুয়াল প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষক যে কোনো প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে ছবির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে সেই বিষয়ে আরও জানার আগ্রহ বৃদ্ধি হতো। এছাড়া সাধারণ সরকারি স্কুলগুলিতেও বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে পড়ানো বা ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়েই বিভিন্ন প্রজেক্ট মডেল তৈরি করে তাদের সেই বিষয়ে আরও আগ্রহী করে তোলার একটি নিয়মিত প্রচেষ্টা করা হতো। এছাড়া উঁচু শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ে ল্যাবরেটরিতে প্র্যাকটিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা এসময়ে অনেকটাই ব্যাহত। অনলাইনে মোবাইলে ক্লাস করার আগ্রহ কম থাকার ফলে স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে বহুক্ষেত্রে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে মোবাইল ফোন নেই সেটাও একটি বড়ো সমস্যা। সর্বোপরি স্কুলে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে সময় সম্পর্কে সচেতন থাকে পড়ুয়ারা যা আজ একেবারে নেই। আরেকটি বিশেষ চিন্তার বিষয় হলো ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে না পারায় অমনোযোগীও হয়ে পড়ছে। অনলাইনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিডিয়ো বন্ধ রাখা হয়। ফলে তাদের স্কুল ইউনিফর্মে উপস্থিতির আগ্রহ কমে যাচ্ছে।

'স্কুল' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে ছাত্র-ছাত্রীদের আরেকটি বৃহৎ জগৎ। ছাত্রজীবনের অর্ধেকটা সময় যায় স্কুল প্রাঙ্গণে। সেখানকার পরিবেশ, ক্লাসঘর, চক্-ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড সবকিছুর সঙ্গেই একজন শিক্ষার্থী তার আত্মিক যোগ খুঁজে পায়। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা হয়ে ওঠেন বাবা-মায়ের প্রতিরূপ, অভিভাবক। এমনকী স্কুলের দারোয়ান কাকু ক্যান্টিনের কাকু বা স্কুল বাসের কাকু সকলের সঙ্গেই গড়ে ওঠে পারস্পরিক সখ্য। আর তার থেকে বড়ো যে সম্পদ তা হলো স্কুলজীবনের বন্ধুত্ব। যে বন্ধুত্ব সারা জীবনই সুখস্মৃতি বহন করে। ছাত্রজীবনে বন্ধুদের সঙ্গে নানান ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে মানসিক বিকাশ ঘটে। স্কুল প্রাঙ্গণে স্বতঃস্ফূর্ত খেলাধুলার ফলে গড়ে ওঠে শারীরিক গঠন। বলা যায়, একটি শিশুর কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ওঠার অনেকখনি নির্ভর করে স্কুলের পরিবেশের ওপর। অথচ সেই সূত্রটিই ছিন্ন হয়েছে এই অতিমারীর করাল গ্রাসে।

একটানা ঘরে বসে থাকার ফলে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। সেই সঙ্গে মানসিক ক্লান্তি আসছে। চিকিৎসকেরা তো আগেও সাবধান করে দিয়েছেন যে বেশিক্ষণ মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহার করলে চোখের ক্ষতি হবে। হলদিয়ার চক্ষুরোগ চিকিৎসক ডাঃ শুভ্রা শীল জানিয়েছেন, খুদেরা একটানা অনলাইন ক্লাসে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তাদের চোখে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তবে চোখের সঙ্গে অন্যান্য সমস্যাতেও ভুগছে পড়ুয়ারা। দীর্ঘক্ষণ মোবাইল ফোন হাতে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের হেডফোন ব্যবহার করছে। এর ফলে শ্রবণ সংক্রান্ত সমস্যার শিকার হচ্ছে তারা। হলদিয়ার নাক-কান-গলা (ইএনটি)-র চিকিৎসক ডাঃ বিধান রায় জানান, প্রতিদিনই কানের সমস্যা নিয়ে ছোটোরা আসছে। ডাঃ রায় বলেন, অভিভাবকরা খুবই চিন্তিত। ছেলে-মেয়েদের কানে শুনতে অসুবিধে হচ্ছে অথচ এর তো কোনো সমাধানও নেই এই মুহূর্তে। তিনি বলেন, 'লাউড স্পিকার ব্যবহার করতে হবে, অনলাইন ক্লাসগুলিতে যদি দেখার ফ্রেম বড়ো করা যায় তাহলেও সুবিধা। তাছাড়া ক্লাসগুলিকে ছোটো ছোটো পর্যায়ে নিলেও ছেলে মেয়েদের মানসিক চাপ কমবে।' চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছোট্টো প্রিয়ম ঘোষ বলছে, 'হেডফোনে ক্লাস করার পর কান ব্যথা করে। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।'

চিকিৎসকদের একাংশের মত, একটানা হেডফোন কানে থাকার জন্য ছেলে-মেয়েদের চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে। একটুতেই বিরক্তি-সহ নানান ব্যবহারিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্যবহারিক পরিবর্তনে দেখা যাচ্ছে ওরা বাড়িতে ঘন ঘন ফ্রিজ খুলে নানা ধরনের খাবার খাচ্ছে। ফলে খেলাধুলার মধ্যে না থাকায় শরীরে মেদ জমছে, তার থেকেও নানান রোগের সৃষ্টি হতে পারে। অভিভাবক ইন্দ্রদীপ ভৌমিক বলছেন, 'ছেলে ঘরবন্দি থাকার জন্য ভীষণভাবে জেদি হয়েছে। আমরা নানা ধরনের কাজে ছেলেকে যুক্ত করেছি।

কম্পিউটার কোডিঙের ক্লাস করছে সে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অনলাইন ক্লাস করার পর মানসিক ও শারীরিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।'

কিন্তু বাস্তবিক বিষয় হলো অভিভাবক ও চিকিৎসক উভয়েই স্বীকার করছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র ভরসা হলো এই অনলাইন ক্লাস। এখন তো টিউশন, নাচ, গান এমনকী ক্যারাটের ক্লাসও অনলাইন শুরু হয়েছে। সুতরাং এখন আমাদের ভাবতে হবে এই নতুন পদ্ধতিটিকেই কীভাবে উপযোগী করা যায় যাতে একটি শিশু বা বয়ঃসন্ধিতে পা দেওয়া কোনো পড়ুয়ার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রবীর ভৌমিক জানান, ছেলে-মেয়েরা মাঠে যেতে পারছে না, রোদ না লাগায় ভিটামিন তৈরি হচ্ছে না। ভিটামিন ডি শরীর মন চনমনে রাখতেও সাহায্য করে। সুতরাং অভিভাবকদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে, মাঠে নয় অন্তত বাড়ির ছাদে বা বাগানে নিয়মিত বাচ্চাকে নিয়ে যেতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন অনুপম পালধি। তিনি জানান, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটোদের ক্লাসিক সিনেমা দেখিয়ে অথবা গান শোনার মাধ্যমে মন ভালো রাখা যায়। দাবা, ক্যারামের মতো খেলাতেও অভিভাবকদের ওদের সঙ্গ দিতে হবে।

একজন অভিভাবক হিসেবে যদি এই বিষয়টিতে আমি নিজের মতামত রাখি তবে বলব, আমার ছেলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। আমার মনে হয়, এক অদ্ভুত কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সদ্য ১৪-তে পা দেওয়া ছেলের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিতে তার মনের আনাচেকানাচে ঢুকতে গেলে তার বন্ধু হতে হবে আমাকে। সারা বিশ্ব যখন এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের হাতের তালুতে, তখন সঠিক বেঠিকের ধারণার স্পষ্ট ছবিটা আমাদেরই তো আঁকতে হবে ওদের চোখে। আমাদের সময় দিতে হবে বাবা-মা দুজনকেই, যাতে বন্ধুত্বের অভাব বোধ না করে, আবার একইসঙ্গে সঠিক শাসনও চাই। নিয়মিত বাগানে যাওয়ার উৎসাহ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগাসন, প্রাণায়াম এবং ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজেও উৎসাহিত করতে হবে। এর সঙ্গে পড়াশুনা ছাড়া যে বিষয়গুলিতে তারা আগ্রহী সেগুলির প্রতি আরও বেশি মনোযোগী করতে হবে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে। এছাড়া গল্পের বই পড়া বা ভালো গান শোনার সুঅভ্যাস গড়ে তুলতে হবে আমাদেরই। অভিভাবক হিসেবে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু প্রশ্ন উঠে আসে মনে। সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সকলেই অবগত আছি। সরকারি চাকুরি ছাড়া বেসরকারি সংস্থানে চাকুরিরত অভিভাবকদের বা মাঝারি বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গ্রাফটি যে দ্রুতগতিতে নেমেছে তাতে সার্বিকভাবে জীবনযাপনের মানে তার প্রতিফলন ঘটছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বেসরকারি স্কুলগুলির ফিজ বাড়ানো অত্যন্ত অমানবিক পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। বিশেষ

শিশুদের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ

কোভিড-১৯-এর কারণে আমার সন্তানদের ওপর প্রভাব কীভাবে পড়েছে তা বলাই বাহুল্য, খুবই অদ্ভুত যা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। আমার মেয়ে ও ছেলে যথাক্রমে পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। সকালে তারা নিয়ম মেনে স্কুলে পৌঁছোত ন'টা কুড়ির মধ্যে। যেহেতু আমরা দু'জনেই কর্মরত, সেজন্য ওদের স্কুলের ক্লাস হয়ে যাবার পর সেখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে বিশ্রাম করা বা ঘুমোনো, অতিরিক্ত কোনো পড়াশোনা বা প্রজেক্টের কাজ, নাচ বা গান বা আঁকা, খেলাধুলো সবই সেখানকার শিক্ষক বা শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে করত। খুব আনন্দে ওদের দিন কাটত। সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ আনতে যেতাম। ওদের বন্ধুদের মধ্যে এত সুন্দর এক বাঁধন দেখতাম তা চাক্ষুষ না করলে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বিকেলে ওরা স্কুলের দোলনায় এক এক করে চড়তো, কখনো তা নিয়ে সমস্যা হতে দেখিনি। দিনেরবেলায় আমাদের মতো কর্মরত মা-বাবার কাছে এগুলো পরম প্রাপ্তি। বাচ্চাদের হাসিমুখটা দেখা, তাদের নিজেদের জগতে বিচরণ করতে দেখে আনন্দে মন ভরে যেত।

২০২০ সাল থেকে কোভিড-১৯-এর কারণে পৃথিবীব্যাপী লকডাউন শুরু হওয়ার পর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার তাল ও ছন্দ সবটাই কর্পূরের মতো উবে গেছে। প্রথমদিকে স্কুলে না যাবার আনন্দে কিছুদিন বিভোর থাকলেও বন্ধুদের সংস্পর্শের অভাব ওদের একাকিত্ব গ্রাস করতে থাকে। ফলস্বরূপ মোবাইল গেমের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। স্কুলের পড়াশোনা অনলাইনে শুরু না হওয়ায় কোভিড-১৯ মহামারী এবং লকডাউন উভয়ে বয়ে নিয়ে আসে এক ভীষণ ভয় ও অস্থিরতা। এই পরিস্থিতি বাচ্চাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে। সংক্রমণের ভয়ে বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকার এই অভিজ্ঞতায় বাচ্চা-সহ সকলেই মনমরা। আমরা তবু মাঝে মাঝে বাজার বা অফিস গেলেও বাচ্চাদের চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই কাটে। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে মোবাইল ফোন। অনলাইন ক্লাসের তালিকা শেষ হতেই মোবাইল গেমে বুঁদ হয়ে পড়ে। বারে বারে বলা সত্ত্বেও পড়াশোনা, স্নান, খাওয়া সব কিছুর ছন্দ হারিয়ে ওদের মন একেবারে কেন্দ্রীভূত মোবাইল ফোনে। প্রতিদিন নতুন নতুন সমাধানের পথে হেঁটে তাদের বিশেষত এই মুহূর্তে স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় রাখাই আমাদের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(কমলিনী বিশ্বাস, সরকারি কর্মচারী)

ভার্চুয়াল ! আশঙ্কার জায়গা এখানেই

বাঙ্গলায় 'ভাচুয়াল' শব্দটির নিকটস্থ আভিধানিক অর্থ যেটা পাওয়া গেল সেটা হলো--- অপার্থিব ! অর্থাৎ সন্দেহ ও একটুকরো কাপড়ে ঘেরা নিঃশ্বাসের এই কঠিন সময়ে সভ্যতার এক বৃহদ অংশের জীবন, জীবিকা, সম্পর্ক, যোগাযোগ— সবটাই অপার্থিব ? এমন চিন্তা ও চেতনা আত্মাকে চঞ্চল করে তোলে বৈকি। সেই চঞ্চলতা আমার ঘরেই বেড়ে ওঠা ছোট্ট ভবিষ্যৎটির ভাবনায় এক সময় আশঙ্কায় পরিণত হয়। হ্যাঁ, আমি একজন পিতা। আমার একমাত্র সন্তান কলকাতায় এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

জন্মের কিছুকাল পর্যন্ত নানা সম্পর্কের চাঁদ বা ঘুমের দেশের মাসি ও পিসিদের সেই অপার্থিব জগৎ ধীরে ধীরে আমরা তাকে চিনিয়েছি দেখার, শেখার এবং বেড়ে ওঠার বাস্তব মাটি। এই 'আমরা'— কথাটির মধ্যে তার বাবা, মা-র ঠিক পরেই তার স্কুলের স্থান, হয়তো আগেই। কিন্তু আজ তার সেই স্কুল আর তার অনুভূতিটুকু প্রায় পুরোটাই তার কাছে— অপার্থিব অর্থাৎ ভার্চুয়াল ! আশঙ্কার জায়গা এখানেই।

(অভিজিৎ মহিন্তা, ব্যবসায়ী)

অনলাইন পড়াশোনাতে মন বসে না

একদিন সকালে হঠাৎ জানতে পারলাম যে লকডাউন ঘোষণা হয়েছে। দিনটি ছিল সোমবার। ২২ মার্চ। তখন মনে হয়েছিল কয়েকটি মাস বোধহয় স্কুলে যাওয়া হবে না, কিন্তু হতে চলল প্রায় দু'বছর। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। স্কুলের সেই শিক্ষিকারা যাঁরা আমাকে খুব ভালোবাসেন তাঁদের সঙ্গেও কথা হয় না। মা-বাবা অফিস যাচ্ছেন, দোকানপাটও সব খোলা। শুধু আমরাই মোবাইল ফোনের ছোটো পর্দায় আবদ্ধ। সারাদিনটাই কাটে অনলাইন ক্লাসে। সেখানে না আছে বন্ধুদের সঙ্গে ফিসফিস করে গল্প, আর না আছে প্রশংসা বা বকাঝকা। অনলাইন পড়াশোনাতেও কেন জানি মন বসে না। গুরুজীর কাছেও গান ঠিকমতো শেখা হচ্ছে না।

মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে কথা হয় ফোনে কিন্তু স্কুলের সেই মাঠের খেলা, হাসিমজা কিছুই হয় না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, পৃথিবী যেন পুরোপুরি এই অতিমারিকে অতিক্রম করে আগের সেই সোনালি দিনগুলো যেন সবার কাছে ফিরে আসে।

অগ্নিদীপ্ত দে, অষ্টম শ্রেণী, হরিদেবপুর, কলকাতা-৮২

করে এটি একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ যে পরিসেবাটি বাচ্চা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পাচ্ছিলো তা কখনোই একটি অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে তাকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা প্রদানের গুণগত মানটিও স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিশ্লেষণ করতে হবে। যেহেতু অনলাইন তাই ছোটো ছোটে গ্রুপে ভাগ করে পড়ালে বাচ্চাদের সঙ্গে ওয়ান-টু-ওয়ান ইন্টার‍্যাকশন সম্ভব, সেদিকটি স্কুল কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করা উচিত।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এই ফলের আগামীদিনে পরিণাম কী হবে তা খুবই সংশয়ের বিষয়। ২০২১-এ অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই মাধ্যমিকের ফলটিও বোধহয় ইতিহাস সৃষ্টি করলো। পাশের হার ১০০ শতাংশ, সর্বোচ্চ নম্বর ৬৯৭ পেয়েছে ৭৯ জন পরীক্ষার্থী যা পশ্চিমবঙ্গ কেন গোটা পৃথিবীতে বোধহয় নজির নেই। গত বছরও মাধ্যমিকে পাশের হার ছিল ৮৬.৩৪ শতাংশ। তখনও ছিল করোনা পরিস্থিতি।

শিক্ষা পর্ষদ এবারে এক বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করেছে, করোনার লকডাউন পরিস্থিতিটি আমাদের সকলেরই মাথায় আছে কিন্তু এ বিষয়টিকে নিয়ে কি আরও একটু সচেতনতার পরিচয় দেওয়া যেত না? একজন পড়ুয়ার জীবনে মাধ্যমিক হলো বড়ো পরীক্ষার প্রথম ধাপ। এর ফলাফলের ওপরেই তার আগামীদিনের জীবনের দিক নির্দেশ হয়। সুতরাং সঠিক মূল্যায়ন অতি আবশ্যক ছিল। যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গবাসীর বোধহয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এই দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকটির সঙ্গেও আপোশ করে নিতে হবে। যে রাজ্যে চূড়ান্ত লকডাউনের সময় সব দোকান বন্ধের মধ্যে মদের দোকানের সামনে লম্বা লাইন দেখতে হয়, দিনের পর দিন হকারদের দুর্দশা দেখেও লোকাল ট্রেন বন্ধ রাখা হয়, যেখানে মেট্রো রেলে ৫০ শতাংশ যাত্রীর বিধিনিষেধ আর বাসগুলি ভিড়ে ঠাসা দেখতে হয়, সেখানে আমাদের মানিয়ে নিতেই হবে যে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত সিস্টেমের সঙ্গে এডুকেশনাল সিস্টেমটিতেও ধস নেমেছে। শুধু ভাবি, একজন অভিভাবক হিসেবে মনের গভীরে প্রতিনিয়ত একটি একটি করে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে প্রশ্ন, দুশ্চিন্তা, ভয় ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা। তবুও আমরা আশাবাদী, এই দুশ্চিন্তার কালো ছায়া সরে যাবে একদিন, দুষ্টু দৈত্য 'করোনা' পরাজিত হবে ঠিক। স্কুল খুলবে, স্কুলের মাঠে বাচ্চারা দৌড়ে বেড়াবে, বাচ্চাদের কলরবে মুখরিত হবে স্কুল প্রাঙ্গণ, দিদিমণির হাতের স্পর্শে শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ। মা সরস্বতীর অপার কৃপায় আশীর্বাদধন্য আজকের বিদ্যার্থীই হবে আগামী দিনের পথপ্রদর্শক। □

মহারাণা প্রতাপ ও হলদিঘাটের অবিস্মরণীয় সংগ্রাম

ডাঃ আর এন দাস

বারংবার বিদেশি আক্রমণে আমাদের পূর্বজরা যখন দিশেহারা ছিলেন, তখন রাণা প্রতাপ (১৫৪০-১৫৯৭) আবির্ভূত হন রাজস্থানের উষর মরুভূমিতে।

১৫৭৬ সালে ২১ জুন হলদিঘাটের সেই ভীষণ রণাঙ্গনে, সত্যিই কি সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) প্রতাপকে পরাজিত করেছিলেন? বিষয়টি বিতর্কিত। আসলে, কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানের গেহলট সরকার ও মধ্যশিক্ষা পরিষদের নির্দেশেই পাঠ্যপুস্তকগুলির মাধ্যমে শিশু-মস্তিষ্কে এখন থেকেই ঢুকিয়ে দেওয়ার অক্লান্ত প্রয়াস চলছে, যাতে করে আকবরকে মহান দেখানো যায়, রাণাকে দুর্বল ভাবা হয় আর সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের আড়ালে মুসলমান তুষ্টিকরণ নীতি অব্যাহত থাকে। সেদিন কিন্তু গেহলট আর শিশোদিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের বীরপুরুষরাই মোগল আক্রমণকে প্রতিহত করে রেখেছিল। আজ রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী গেলহট ও শিশোদিয়া বংশের উত্তরসূরি দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী জেহাদি ভোট-ভিক্ষা করেই সত্তা দখল করে রয়েছেন।

৩.৪২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট রাজস্থান হচ্ছে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য। সে সময় মোগলরা রাজস্থানের অনেক রাজাকেই ছলেবলে ও কৌশলে বশে এনেছিল। আজকের জয়পুর সেদিনের অম্বর প্রদেশের কুচ্ছওয়াহা নামে পরিচিত ছিল। সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে, অম্বরের দুর্ধর্ষ সৈন্যরাই মোগলসেনার অগ্রভাগে থাকত। মানসিংহ ছিলেন কুচ্ছওয়াহা প্রদেশের স্বাধীন রাজা। নিজেকে সমগ্র রাজপুতানার একছত্র অধিপতি বলে মনে করতেন। মানসিংহ ঘৃণ্য শর্তে বিধর্মী আকবরের গোলামি স্বীকার করেন। তিনি মোগলবাহিনীর সাহায্যে স্বাধীনতার পূজারি প্রতাপকে ধরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রও করেন। বহুদিন ধরে হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দুকে লাগিয়ে যুদ্ধজয়ের কৌশল মুসলমানরা আয়ত্ত করেছে। অথচ হিন্দুনামধারী উর্বর মস্তিষ্কের সেকুলারপন্থীরা সেটা আজও বুঝল না। মেবারের শিশোদিয়ারা কিন্তু এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তাই, রাণা সাঙ্গা বা মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে মোগলদের বিরোধ বাঁধে। রাজা উদয়সিংহের পুত্র, অদম্য সাহসী রাণা সাঙ্গার সুযোগ্য পৌত্রই হলেন মহানায়ক রাণাপ্রতাপ।

শিশোদিয়াদের চিরশত্রু ছিল মোগলরা। ফলে বহুবার যুদ্ধ হয়েছে। মুসলমানরাও কখনও রাজপুতদের বিশ্বাস করত না। আকবর ছিলেন মহাধূর্ত। তিনি জানতেন সমগ্র রাজপুতানাকে জয় করতে হলে মেবারকে আগে কব্জা করতে হবে। তাই তিনি কুটনৈতিক চাল চেলে মেবারের সঙ্গে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করলেন। পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। তখন রাজপুতদের মধ্যে বিভেদের রাজনীতি শুরু করলেন। রাজদূত হিসেবে মানসিংহ স্বয়ং প্রতাপের দরবারে এসে, তারই মতো সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে, সামন্ত রাজার দায়িত্ব পালন করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা প্রতাপ সেই প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করলেন। মানসিংহকে আকবরের দাসত্ব অস্বীকার করার অনুরোধও জানালেন।

রাতের ভোজসভায় মহারাণা প্রতাপ নিজে না এসে, ছেলে অমরসিংহকে পাঠালেন মানসিংহের সঙ্গে খেতে বসতে। বলে পাঠালেন, 'রাজার সঙ্গে রাজা খায়; সামন্ত রাজার সঙ্গে কোনো স্বাধীন রাজা খায় না'। এতে মানসিংহ অপমানিত বোধ করে তৎক্ষণাৎ মেবার ত্যাগ করে আকবরকে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করলেন। আকবর এই সুযোগেরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। ভীতু আকবর নিজে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন না। পাঠালেন সৈয়দ হাসিমের নেতৃত্বে বিশাল মোগলসেনা যার অগ্রভাগে থাকলেন স্বয়ং মানসিংহ প্রতিশোধ নেবার জন্য।

ইতিহাসবিদদের মধ্যেই মতভেদ আছে। কেউ বলেন, সেদিন মেবারের মাত্র তিন হাজার, অন্যদিকে মোগলের দশ হাজার সেনার মধ্যে লড়াই হয়েছিল। মেবারের নিজস্ব ইতিহাস থেকে জানা যায়, মোগলদের পক্ষে ছিল আশি হাজার সৈন্য। প্রতাপের পক্ষে ছিল ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক মিলিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার। এটাও অত্যুক্তি বলেই মনে হয়। তবে হ্যাঁ, মানসিংহের নিজেরই পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে বহু পদাতিক সেনা ছিল। তাকে সাহায্য করেছিল রাজপুতানার বহু সামন্তরাজা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, অম্বরের

রাজা রাও লুনকরণ ও কুচ্ছওয়ার অন্য সামন্তরাজা জগন্নাথ সিংহ। ফতেপুর সিক্রির সেলিম চিশতি, সৈয়দ হাসিম এবং তার ভাইরাও মানসিংহের সঙ্গে যোগ দেয়। মধ্য এশিয়া থেকে আসে দুর্ধর্ষ গাজি খান। এক হাজার কাফেরের কাতিলের উপাধিই হলো গাজি।

অন্যদিকে প্রতাপের পক্ষে ছিল বিখ্যাত জয়মল রাঠোরের ছেলে রামদাস রাঠোর যিনি প্রতাপের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে আত্মাহুতি দেন। পিতা জয়মল যখন চিতোর দুর্গ মেরামত করাচ্ছিলেন, বহুদূরে লুকিয়ে থাকা আকবর গাদাবন্দুক চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। মেবারের পক্ষে ছিল গোয়ালিয়রের সিংহাসনচ্যুত রাজা রামশাহ তানওয়ার, তার বড়ো ছেলে শালিবাহন ও দুই ভাই। আফগান বাদশা শেরশাহ সুরির বংশধর হাকিম খান সুরও প্রতাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ভামা শাহ আর তার ভাই তারা চাঁদও মেবারের সেনাদের পক্ষে ছিল। দদিয়ার ভীমসিংহও প্রতাপের দলে যোগ দেয়। প্রতাপের প্রিয়, বনবাসী ভীলদের প্রধান রাও পুঞ্জা ও বীর ঝালামান ওরফে বিদ্‌মানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোগলের বিশাল বাহিনী ও মেবারের ক্ষুদ্র শক্তির এই অসমযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বোধহয় ১৮ বা ২১ জুন, ১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের রুক্ষ, ঊষর পার্বত্যভূমিতে ঘটেছিল, ইতিহাস প্রসিদ্ধ অবিস্মরণীয় রক্তক্ষয়ী এই সংগ্রাম। মানসিংহ সুরক্ষিত ছিলেন মোগলসেনার মধ্যস্থলে। অগ্রভাগে ছিল কুচ্ছওয়ার জগন্নাথ, বক্সি আলি আসফ খান এবং বিলোল খান পাঠান। পশ্চাৎভাগে ছিল মাধোসিংহ ও মেহতার খান। দক্ষিণে সৈয়দ হাসিম ও তার ভাইরা। বামে ছিল রাও লুনকরন, গাজি খান ও সেলিম চিস্তি।

প্রতাপের সেনার অগ্রভাগ পরিচালনার দায়িত্ব ছিল রামদাস রাঠোরের। তাকে সাহায্য করছিল ভীমসিংহ ও হাকিম খান। ভাই তারাচাঁদের সঙ্গে বীর ভামাশাহ, গদিচ্যুত রামশা তানওয়ার এবং তার তিন ছেলে মেবারীসেনার দক্ষিণ দিক সামলাচ্ছিল। বামদিক রক্ষার ভার ছিল ভয়ানক ভীল যোদ্ধা ঝালা মানের উপর।

প্রতাপ জানতেন নিজের ক্ষুদ্র সৈন্যদল আর মোগলের বিশাল সেনার কথা। একদিকে ছিল মাতৃভূমি রক্ষার মরণপণ ও স্বাভিমানের লড়াই। অন্যদিকে বিধর্মীদের ছিল 'গনিমত' লুট করার নেশা। তাই সেদিন প্রতাপ সর্বশক্তি দিয়ে অতর্কিত ও ভয়ানক আক্রমণে হলদিঘাটের গিরিখাতে শত্রুসেনাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন। মেবারবাহিনীতে রামশাহর অশ্বারোহীরা ঝটিকা আক্রমণে মোগলসেনার বাম দিকে থাকা রাও লুনকরণ ও গাজি খানের সৈন্যদের গাজর-মুলার মতো কচুকাটা করতে লাগল। সেলিম চিস্তি পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। ঝালা মানের অশ্বারোহীরা ডান দিকের সৈয়দ হাসিমের সেনার উপর চড়াও হলো। রামদাস রাঠোর, ভীমসিংহ ও হাকিম খান সুর মেবারের অগ্রণী সেনাদের নিয়ে সামনাসামনি লড়াইয়ে মেতে উঠেছিল।

এই সুযোগে বিলোল খান ও মানসিংহের নেতৃত্বে মোগলবাহিনী মধ্যস্থলে থাকা প্রতাপের উপর আক্রমণ চালায়। রাণাপ্রতাপের উচ্চতা ছিল ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি। তিনি ৮০ কেজি ওজনের বল্লম ছুঁড়তে পারতেন। প্রতাপের বর্ম-আবরণের ওজন ছিল ৭২ কেজি। তিনি ২৪ কেজির দুটি তলোয়ার দু' হাতে চালাতে পারতেন। সেসব অস্ত্রশস্ত্র জনসাধারণের দর্শনের জন্য উদয়পুরের রাজকীয় সংগ্রহশালায় আজও রাখা আছে।

প্রতাপ মস্ত তরবারির এক আঘাতেই ঘোড়া সমেত বিলোল খানকে দু' টুকরো করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার বিশদ বিবরণ রাজস্থানের লোকসংগীত ও শিল্পকলায় স্থান পেয়েছে। শত্রুসৈন্য রাণাপ্রতাপের এই ভয়ংকর মূর্তি দেখে প্রাণ ভয়ে পালাতে শুরু করে দিল।

দদিয়ার ভীমসিংহকে সামনে রেখে রাণা মোগলবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে থাকা মানসিংহকে আক্রমণ করলেন। চেতক ছিল বিশালাকার ঘোড়া। ঘোড়ায় চেপে ভীমসিংহ হাতির পিঠে থাকা মানসিংহকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু পিছন থেকে মেহতার খানের আঘাতে ভীমসিংহ নিহত হলেন। রাণা এই দৃশ্য দেখে এগিয়ে এলেন। অসমসাহসী চেতক দু'পা তুলে দিল হাতির মাথার উপর। হাতির শুঁড়ের সঙ্গে বাঁধা ছিল ধারালো তলোয়ার। চেতকের পা তাতে গেল কেটে। রাণা বিশাল বল্লম ছুঁড়লেন মানসিংহকে লক্ষ্য করে। মানসিংহ প্রাণে বাঁচলেও হাওদা সমেত মাহুত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মেহতাব খানের সেনারা রাণাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। রামশা তানওয়ার ছুটে এলেন রাণাকে বাঁচাতে। কুচ্ছওয়ারের সামন্তরাজা জগন্নাথ তাকে আক্রমণ করল। বীরগতি প্রাপ্ত হলেন রাণার সবথেকে বিশ্বস্ত পর্ষদ রামশাহ।

ঝালা মান বিপদ বুঝে ছুটে গেলেন মহারাণাকে রক্ষা করতে। রাণার পতাকাটি এক ঝটকায় টেনে নিয়ে মোগল সেনাকে বিভ্রান্ত করে বিপরীত দিকে তীব্রগতিতে ছুটতে লাগলেন। প্রতাপ সেই সুযোগে পিছিয়ে এলেন রণাঙ্গন থেকে। রাণার প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে ভীলবীর ঝালা বীরগতি প্রাপ্ত হলেন। মোগলসেনারা শীঘ্রই বুঝতে পারলো তাদের ভুল। কিন্তু ততক্ষণে আহত ও রক্তাক্ত প্রভুভক্ত চেতক তিন পায়ে মহারাণাকে ৫ কিমি দূরে ২২ মিটার চওড়া একটা ছোটো নদী এক লাফে ডিঙ্গিয়ে প্রতাপকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে, শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আজও সেখানে চেতকের সমাধিস্তম্ভ রক্ষিত আছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৬-তে আলেকজান্ডারের ঘোড়া বুকেফেলাসের সমাধিও আছে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের জালালপুরে ঝিলম নদীর পাড়ে যেখানে আর্যবীর পৌরুষের সঙ্গে প্রথম বিদেশি আক্রমণকারীর যুদ্ধ হয়েছিল।

মোগলসেনারা সেই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় মহারাণাকে আর খুঁজে পায়নি। কথিত আছে, প্রতাপের ভাই শক্তিসিংহ ওরফে শক্তসিংহ রাণার রাজ্যাভিষেকের সময় অসন্তুষ্ট হয়ে আকবরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝে এবং অন্যান্য রাজপুত বীরদের শৌর্যবীর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রক্তাক্ত ও রণক্লান্ত অগ্রজকে নিজের ঘোড়া দিয়ে পলায়নে সাহায্য করেছিলেন।

রামদাস রাঠোর ও মেবারের অন্যান্য সেনাপতিরা যখন জানতে পারলেন মহারাণার নিরাপদ আশ্রয়ের কথা, তখন তারাও সাফল্যের সঙ্গে দুরারোহ পর্বতের ঘনজঙ্গলে আত্মগোপন করল। দিয়ারের দুর্গম পাহাড়ে মেবারীসেনার হাতে মোগলবাহিনী ছিন্নভিন্ন হলো। রামদাস রাঠোর ও অন্যান্য বহু বীর ভীল যোদ্ধারা পর্বতের অন্তরালে ওত পেতে থেকে মোগলসেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন এবং মাতৃভূমি রক্ষার্থে বীরগতি প্রাপ্ত হলেন। অতর্কিত গেরিলা আক্রমণের ভয়ে মোগলসেনারা পালাতে লাগল। শেষে রাণাকে না পেয়ে বহু কষ্টে তার প্রিয় হাতি রামপ্রসাদকে বন্দি করে আকবরকে উপহার দিল। বিধর্মীরা নাম দিল পির প্রসাদ। প্রভুভক্ত পশুটি নির্জলা উপবাস করে বন্দিশালাতেই প্রাণ ত্যাগ করল। পালিয়ে যাওয়া মোগলসেনাদের পরিত্যক্ত প্রচুর ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, তাঁবু, খাবার ও রসদসামগ্রী রাণা প্রতাপের সৈন্যরা নিজেদের অধিকারে নিল। হাতি, ঘোড়া, রথ, কামান, বন্দুক সমন্বিত বিশাল মোগলসেনার ক্ষয়ক্ষতি হিসেব করলে দেখা যায়, মহারাণার দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীদের দ্বারা তারা শুধু পরাজিতই হয়নি বরং দ্বিতীয়বারের জন্য রাণার সঙ্গে লড়াইয়ের সাহসটুকুও হারিয়েছিল। □

বাঙ্গলায় মোদী বহিরাগত হলে গুজরাটে মমতা ব্যানার্জি কী?

মাত্র কয়েকদিন আগেই আপনারা বহিরাগত তত্ত্বকে খাড়া করেছিলেন। কাদের বিরুদ্ধে করেছিলেন? অন্য রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিশানা করে। বাদ যাননি প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও। তাহলে এখন বাইরের রজ্যের মানুষ কী আপনাদের পরম আত্মীয় বলে মেনে নেবে? নাকি অন্য ভাবে আপনারা হঠাৎ অন্য রাজ্যের মানুষের কাছের মানুষ হয়ে উঠবেন?

জাহ্নবী রায়

অমর একুশে জুলাই। ১৯৯৩ সালের সেই ঘটনা। যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যুব শাখার একটি আন্দোলনে রাজ্যের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালালে ধর্মতলা ও সংলগ্ন অঞ্চলে তেরোটি তাজা প্রাণের বলি চড়েছিল। সেদিনের সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী, আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯২ সালে মমতা তখন কেন্দ্রে নরসিমা রাওয়ের মন্ত্রীসভায় ক্রীড়ামন্ত্রী। সেবছরেই তিনি ১৪ বছরের বাম শাসনের অবসান চেয়ে ব্রিগেডে মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে এসেছে ফেলানি বসাক ধর্ষণের ঘটনা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে রাইটার্সে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আরও অনেক দাবির সঙ্গে ছিল সচিত্র পরিচয়পত্রের ভোটের দাবি। কেননা এর পিছনে ছিল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের তত্ত্ব, সঙ্গে আর একটি প্রতিবাদ, 'ভোটে বামেদের সায়েন্টিফিক রিগিং'। সব মিলিয়ে ২১ জুলাই, ১৯৯৩, রাজ্যের রাজপথে একেবারে জঙ্গি আন্দোলনে নেমেছিল যুব কংগ্রেস। সেদিন লেখা হয়েছিল কলঙ্কিত একটি অধ্যায়। সেদিনের যিনি ছিলেন এই হত্যালীলার মাথা, আজ তিনি রাজ্যের শাসক দলের আদরের মানুষ। এমনটাই হয়। রক্তে রাঙা হাত, স্বার্থের খাতিরে হয়ে যায় প্রিয়। লোক দেখানো শহিদ দিবস উদযাপনে প্রকারান্তরে অপমানিত হন সেদিনের শহিদেরা।

সেই দিনকে স্মরণ করে যুব কংগ্রেস শহিদ দিবস পালন শুরু করে। যখন ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন হলো, সেই শহিদ দিবস হাইজ্যাক হয়ে গেল কংগ্রেসের হাত থেকে। তখন একেবারে নিজের মতো করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালন শুরু করলেন। প্রথম প্রথম এটি শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার সভা হলেও ২০০৯ সালের পর থেকে একেবারে চরিত্র বদলে, তৃণমূল কংগ্রেসের একটি রাজনৈতিক সভায় রূপ নেয়। একটি শহিদ বেদি থাকে নিমিত্ত মাত্র। সেই শহিদ বেদিতে ফুল, মালা দেওয়া হয়। প্রথম দিকে শহিদদের পরিবারের মানুষজনকে দেখা যেত। তাঁদের সামনে রেখে রাজনৈতিক সহানুভূতির একটা হাওয়া তোলার চেষ্টা করতেন মমতা। এখন চরিত্র পালটে সামনের সারিতে দেখা যায় রুপালি জগতের মানুষজনদের। শহিদ দিবসের মঞ্চের জলসায় গান করেন সংগীত শিল্পীরা। আর মঞ্চের পিছনে বসে থাকেন শহিদের পরিবার। এভাবেই একটা রেওয়াজ চলে আসছে বেশ কয়েক বছর। ওই ভিক্টোরিয়া হউসের সামনে। ওই জায়গাটা আবার রাজ্যের শাসক দলের দখলে। ওখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল সভা করার জন্য সরকারি অনুমতি চাইলে পাবেন না।

এবারের করোনা অতিমারির সময়ের ভার্চুয়াল সভাটিও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটাল না। তবে একটি ক্ষেত্রে অমিল। কেন্দ্রের সরকারকে নানা বিষয়ে আক্রমণ করা হলো সভার প্রথম থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত। শুধু তাই নয় মমতা দেবীর এই সভা বিশাল বিশাল স্ক্রিনে দিল্লি থেকে গুজরাট সর্বত্র দেখানো হলো। দিল্লিতে কন্সটিটিউশন ক্লাবে হাজির ছিলেন দেশের ৯টি বিরোধী দলের নেতারা। এই শহিদ সভা নামক একটি রাজনৈতিক সভায় ডাক দেওয় হলো মহাজোটের। কেননা লক্ষ্য ২০২৪-র লোকসভা নির্বাচন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সেখানে আবার শামিল হবে কংগ্রেস। এই নেতাদের আবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই। এই ৯টি প্রধান বিরোধী দল নাকি বন্ধু একে অপরের।

এমনটাই দাবি ডেরেক-ও-ব্রায়েনের। সে যাই হোক, একটি স্বপ্ন দেখর জন্য বীজ পোঁতার চেষ্টা করল তৃণমূল। কেমন হতে পারে জোট? এই জোটের সফলতা কী হতে পারে, সেদিকে রাজনৈতিক ভাবে তাকানোর প্রয়োজন আছে বৈকী? কেননা রাঁধুনি প্রশান্ত কিশোর নয়া দিল্লিতে গিয়ে কড়াই সবে বসিয়েছে। তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় দায়িত্বের অধিকারী, যুবরাজ রয়েছেন তদারকিতে। পিসিমণি ভার্চুয়াল সভায়, তাঁর একমাত্র ভাইপোকে জাতীয় রাজনীতিতে প্রজেকশন করেছেন একেবারে নিখুঁতভাবে। এটাই তো পরিবার তন্ত্রের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যদি কোনোরকম ভাবে সাধের নিধিকে কেন্দ্রীয় রাজ্যপাটে নিয়ে আসা যায়, তাহলে পোয়াবারো। আসলে বিষয়টা তা নয়। রাজ্যের শাসক দল, তৃণমূল কংগ্রেসকে যে করেই হোক সর্ব ভারতীয় জাতীয় দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেটা করতে পারলেই জাতীয় রাজনীতিতে রাজ্যের শাসক দলের একটা দরজা খুলে যাবে। আঞ্চলিক দল হিসেবে যে তকমা গায়ে লেগে আছে, সেটাও সরিয়ে ফেলা যাবে।

রাজ্যের শাসকদল খুব বুক ফুলিয়ে, সারা দেশের বেশ কিছু রাজ্যে ভার্চুয়াল সভাকে জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখিয়েছে। লক্ষ্য, অন্য রাজ্যে পরিচিতি। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের নেতৃত্বের কাছে জানতে ইচ্ছা করে, এই মাত্র কয়েকদিন আগেই আপনারা একটা বহিরাগত তত্ত্বকে খাড়া করেছিলেন। কাদের বিরুদ্ধে করেছিলেন? অন্য রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিশানা করে। বাদ যাননি প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও। তাহলে বাইরের রজ্যে কী আপনাদের পরম আত্মীয় বলে মেনে নেবে? নাকি অন্য ভাবে আপনারা হঠাৎ অন্য রাজ্যের মানুষের কাছের মানুষ হয়ে উঠবেন?

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনঃ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্য অখিলাত্মনঃ।।

(ভা—৮/৭/৪৪)

ভাবার্থ : সাধুগণ প্রায়ই লোকের সন্তাপে ব্যথিত হইয়া থাকেন, অন্যের নিমিত্ত কষ্ট ভোগ করাই বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ আরাধনা।

প্রিয় সুধী,

সপ্রেম নমস্কার,

বর্তমান বছরটিতে আমরা স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করছি। সমগ্র দেশবাসীর কল্যাণে যে সমস্ত ভারতমায়ের সুযোগ্য সন্তানসন্ততি দেশমাতৃকার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য প্রাণ বলিদান দিয়েছেন, তাঁদের বিশেষ ভাবে স্মরণ-মননের জন্য বর্তমান বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসুন, আমরা দেশমাতৃকার এই সুযোগ্য সন্তানদের স্মরণ-মননের মাধ্যমে দেশমাতৃকার চরণে স্বপরিবারে সবান্ধবে অঞ্জলি প্রদান করে নিজেরা কৃতার্থ হই।

বিনীত—
স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন সমিতি
ঘাটাল, পূর্ব মেদিনীপুর।

(বিজ্ঞাপন)

রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো ভার্চুয়াল সভায় ঘোষণা করলেন, '২০২৪-এ খেলা হবে'। ওই ব্যান্ডেজ বাঁধা পা কি আবার ফিরে অসবে? নাকি অন্য কিছু দেখব আমরা?

তৃণমূল সুপ্রিমো ডাক দিয়েছেন, দ্রুত জোট গড়ার। দেশের ৯টি প্রধান বিজেপি বিরোধী দল, যাদের মধ্যে আছে, সোনিয়ার দল কংগ্রেস সমেত শরদ পাওয়ারের দল, ডিএমকে, শিব সেনারা। এদের সবার লক্ষ্য একটাই, কেন্দ্র থেকে যে ভাবেই হোক বিজেপিকে সরাতে হবে। এই জোটের শরিকদের রাজনৈতিক চরিত্র মোটামুটি সবাই জানে। এই মুহূর্তে এরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত। রাজ্যের শাসক দল, তৃণমূল কংগ্রেস ভাবছে, সবাই তাদের নেতৃত্ব মেনে নেবে। এটা ভাবাটাই ভুল। কেননা শিব সেনা। তাঁদের সঙ্গে মেলে না শরদ পাওয়ারের, আবার কংগ্রেসের সঙ্গে এই নয় দলের জোটের সঙ্গীদের ভলোবাসার সম্পর্ক নিয়েও রাজনৈতিক মহলের দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব রয়েছে এর আগে থেকেই। ফলে এই জোট কতটা জমবে বলা শক্ত। এদিকে যদি এই জোটে আসে লালুর দল, মুলায়মের দল, মায়াবতীর দল, অকালিদের একটা অংশ সেখানে একটা দর কষাকষি শুরু হবে। সেটা কে কীভাবে সামলাবে? প্রশ্ন রয়েছে এখানেও।

এই জোটের প্রধানমন্ত্রী প্রজেক্টেড কে হবেন? মমতা? অভিষেক? রাহুল গান্ধী? শরদ পাওয়ার? অরবিন্দ কেজরিয়াল নাকি অন্য কেউ? শিব সেনা ছেড়ে কথা কি বলবে? প্রশ্ন আসছে এখানেও। সবচেয়ে বড়ো কথা এই জোটের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা যে একেবারেই নেই, সেটা ঠারেঠুরে বুঝিয়ে দিচ্ছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, রাজ্যের শাসক দল দেশের ছন্নছাড়া বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দৈন্যপনার সুযোগটা নিতে চাইছে। যদি সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে জাতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূলের পরিচিতি বাড়বে। আর জাতীয় দলের তকমা গায়ে উঠবে।

এবার আসা যাক, তৃণমূল সুপ্রিমোর দলের গণতন্ত্রের কথায়। এখানে শেষ কথা বলেন সুপ্রিমো। দলের আর সবাই অনেকটাই নিধিরাম সর্দারের মতো। পদ থাকলেও ক্ষমতা নেই। একনায়ক তন্ত্রের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রকাশিত আমাদের রাজ্যে। সেখানে রাজনৈতিক ভাবে যারা একটু সিনিয়র ও জাতীয় রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তাঁরা কী মানতে পারবেন মমতাকে?

রাজ্যে দেখতে দেখতে ১১ বছর পেরোল রজ্যের শাসক দল। নানা জায়গায় দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে, রাজ্যের গঠনমূলক অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনা একেবারেই নেই। নেই শিল্পায়নকে ভিত্তি করে কর্ম সংস্থানের সুযোগ। কৃষি সংস্কার যতটুকু হচ্ছে, সবটাই কেন্দ্রীয় নানা প্রকল্পের সুফল। গ্রামীণ কুটীর শিল্পের উন্নয়ন বা সরকারি তরফে উৎসাহ দান তলানিতে। ফলেসেই ধাক্কা কর্মসংস্থানে। একেবারে পঞ্চায়েত স্তরে ঘুঘুর বাসার প্রাধান্য। এছাড়াও আছে আরো অনেক বিষয়, যেগুলি এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যের শাসক দল যখন রাজ্যে দিশা দেখাতে ব্যর্থ সেখানে জোট করে দেশের মানুষের কাছে কী দিশা নিয়ে হাজির হবে? এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলের কাছে। □

একটি সুন্দর বৃক্ষ
যেটি ইংরেজরা উপড়ে ফেলেছিল

পিন্টু সান্যাল

১৮২৬ সালের ১০ মার্চ, মাদ্রাসের গভর্নর থমাস মুনরো ব্রিটিশ সরকারকে একটি জনগণনা ও সার্ভে রিপোর্ট জমা করলেন। এই রিপোর্ট শুধুমাত্র ভারতের ব্রিটিশ সরকারের মধ্যেই আলোড়ন তৈরি করেনি, ইংল্যান্ডের উচ্চ নেতৃত্বের কপালেও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছিল। কি ছিল সেই রিপোর্টে? সেই রিপোর্টে ভারতবর্ষের বিষয়ে এমন কী তথ্য ছিল যা আগে জানা ছিল না?

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ভৌগোলিক সীমা উত্তরে ওড়িশার গঞ্জাম জেলা থেকে দক্ষিণে তামিলনাড়ুর তিন্নেভেলী (বর্তমানে নেল্লাই) এবং পশ্চিমে মালাবার (কেরলে ও কর্ণাটকের সংকীর্ণ উপকূলীয় সমভূমি) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই অংশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,২৮,৫০,৯৪১ এবং সেখানে ১২,৪৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। যদিও এই পরিসংখ্যানের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কারণ ওই জেলার কালেক্টর কোনো কারণে তথ্য জমা করেননি এবং আরও কিছু পার্বত্য অঞ্চল বাদ ছিল।

রিপোর্ট অনুসারে, প্রতি ১০০০ জনে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। যেখানে ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে এই হার যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক ছিল। বস্তুত ইংল্যান্ডের তখন কোনো শিক্ষানীতি ছিলই না। আরেকটি তথ্য যা সম্পর্কে ভারতীয়রা এখনো অজ্ঞাত যে, এই বিদ্যালয়গুলিতে মাত্র ২৪ শতাংশ শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি ছিল, শতাংশের হিসেবে প্রায় ৬৫ শতাংশ।

'দি বিউটিফুল টি' নামক বইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত এই পরিসংখ্যান আমাদের সেই বহু পুরনো ধারণা থেকে বের হতে সাহায্য করবে যে ব্রাহ্মণরাই তখন শিক্ষাক্ষেত্রের বড়ো অংশীদার ছিল, যদিও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রগুলোতে তারাই সংখ্যাধিক্য ছিল।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসে যে, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে লুটতরাজ করতে এসেছিল, তারা বাঙ্গলা, বিহার, পঞ্জাব, বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি-সহ ভারতব্যাপী এই সার্ভে কেন করিয়েছিল?

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের

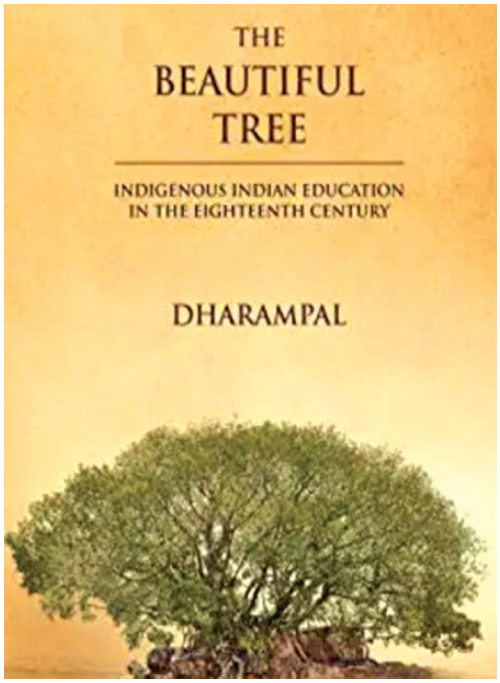

বেশিরভাগ অংশেই নিজেদের শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা এখন সেসব অঞ্চল থেকে আরও বেশি রাজস্ব আদায়ের আশা করছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত অংশ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইংরেজ কর্মচারীর সংখ্যা অনেক কম ছিল। আর বেশি সংখ্যায় ব্রিটিশ আধিকারিক নিয়োগ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই তারা চেয়েছিল এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা, যার সাহায্যে তারা 'তাদের মতো করে শিক্ষিত' ও 'সস্তা' কেরানি পাবে যাদের দিয়ে ব্রিটিশদের প্রশাসনিক কাজ সামলানো যাবে। তারা বুঝেছিল এই 'ইংরেজি বলা মানুষ'গুলো তাদের প্রতি অনুগত থাকবে এবং একইসঙ্গে ভারতবর্ষে সমাজের দুটো শ্রেণী তৈরি হয়ে যাবে, এক যারা 'ইংরেজি বলতে পারে' এবং অন্যরা।

এছাড়াও, ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের খ্রিস্টান ধর্মের দিকে নিয়ে যাওয়া, যাতে করে বিজয়ী ও বিজিত, শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব কমে। এইজন্যে, তাদের প্রয়োজন ছিল নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থার। কিন্তু যে কোনও নতুন নীতি নির্ধারণের আগে, বিদ্যমান অবস্থানটি আরও ভালোভাবে জানা দরকার।

ভারতবর্ষের দেশীয় শিক্ষার সীমা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত

সার্ভের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশাবলী ১৮১৩ সালে 'হাউস অব কমনস্'-এর দীর্ঘ বিতর্কের পরিণতি ছিল। এই বিতর্কটির মূল বিষয় ছিল 'ভারতে ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির প্রচারে গতি আনা'।

এই সার্ভের রিপোর্ট ব্রিটিশদের অবাক করেছিল যে ভারতবর্ষ, এতবার বৈদেশিক আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হলেও এরকম একটি শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো টিকে আছে কেমন করে? প্রত্যেক গ্রামে একটি করে 'মঠ', 'পাঠশালা' বা 'গুরুকুল' ছিল যা ওই গ্রামেরই একটি মন্দির দ্বারা পরিচালিত হতো। গ্রামের মোট জমির প্রায় ৩৫ শতাংশ রাজস্বমুক্ত এবং তা মন্দিরের সম্পত্তির অংশ ছিল। মন্দিরের তত্ত্বাবধানেই সমস্ত উৎসব, অনুষ্ঠান হতো এবং মন্দিরের জমির আয় থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো।

শিশুদের পঞ্চম বছরের, পঞ্চম মাসের, পঞ্চম দিনে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠানো শুভ বলে মনে করা হতো। শিক্ষার এই পবিত্রতা আজও বহন করে চলেছি সরস্বতী পূজার দিন 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। দক্ষিণ ভারতে এই অনুষ্ঠানকেই 'বিদ্যারম্ভ' বলা হয়। প্রত্যেক পরিবার কমপক্ষে তিন বছরের জন্য ছেলেদের বিদ্যালয় পাঠাতো যাতে তারা পড়তে, লিখতে ও সাধারণ গণনা করতে শিখতে পারে।

পরবর্তীকালে সে তার পরিবারের ঐতিহ্য মেনে ও পারিবারিক কোনো ব্যবসার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতো। মেয়েদের সাধারণত বাড়িতেই শিক্ষা দেওয়া হতো। এছাড়াও, গ্রামীণ মন্দিরগুলো সামাজিক অর্থনৈতিক, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও অংশ নিত। মন্দিরগুলি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, বেদ, উপনিষদ এবং আঞ্চলিক সাহিত্যের পাঠাগার হিসেবেও কাজ করতো যা সমাজে 'সরস্বতী ভাণ্ডার' নামে সুপরিচিত ছিল। মন্দিরে একজন বৈদ্য, একজন জ্যোতিষী এবং একজন সেবিকা নিয়োগ করা হতো এবং তাঁদের পারিশ্রমিক মন্দিরের আয় থেকেই আসতো। ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও মন্দির থেকেই করা হতো। এই সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মন্দিরগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক উন্নয়ন যেমন জলসেচ, গৃহনির্মাণ, জলাধারের ও খালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসনে যুক্ত ছিল। এই সমস্ত কাজের জন্য অর্থের জোগান আসতো গ্রামবাসী ও তীর্থযাত্রীদের দান থেকে। সুতরাং মন্দিরগুলি প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে ইংল্যান্ডে কারখানার শ্রমিকরা কাজে যাওয়ার আগে তাদের সন্তানকে যে ঘরে রেখে যেতেন, তারা তাকে 'স্কুল' বলতেন। 'স্কুল' শব্দটির উৎপত্তি এই ভাবেই হয়েছিল। শিশুদের কিছু প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য কারখানার কাজে অক্ষম শ্রমিকদের কাজে লাগানো হতো। সমাজের অবস্থাপন্ন শ্রেণীর জন্য কিছু 'গ্রামার স্কুল' ছিল, যার খরচ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হতো। সর্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ১৮০০ সাল নাগাদ এক অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এই হলো ইংল্যান্ডের সেই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা।

দশম শতাব্দীর শেষে প্রতিষ্ঠিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, উনিশ শতকের শুরুতে ১৯টি কলেজ এবং ৫টি হল ছিল। কলেজগুলিতে প্রায় ৫০০ জন ফেলো ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিটি কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও, ১৮০০ সালে ১৯ জন অধ্যাপক ছিলেন যা ১৮৫৪-তে গিয়ে ২৫-এ দাঁড়ায়।

৭০০ খ্রিস্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ কালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যখন খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে , তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০ জন শিক্ষক ও ১০০০০ জন শিক্ষার্থী ছিলেনন। শুধুমাত্র এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের অক্সফোর্ডের থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দের নালন্দা কতটা এগিয়ে ছিল। বর্তমান পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে খননকার্যে আবিষ্কৃত ষষ্ঠ শতাব্দীর তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আরও পুরনো।

সনাতন ভারতবর্ষের শিক্ষার এই ব্যাপকতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধের একটি অংশ থেকে স্পষ্ট হয়... 'আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হতো সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্য যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কারখানা-ঘর বানাতে হয়নি। দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা- উপশিরা-যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনি করেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজদেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণপ্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চরিত হয়েছে— নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা-বা স্থূল কোনোটা-বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক কলেবর-ভুক্ত নাড়ী এবং রক্তও একই প্রাণ-ভরা রক্ত।'

খুব স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের জাত্যভিমানের পক্ষে এই ব্যাপারটি হজম করা অস্বাভাবিক ছিল যে তাদের দ্বারা বিজিত একটি জাতির এত সুগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল কোনো সরকারি সাহায্য ও অনুমোদন ছাড়াই। তাই তারা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির রিপোর্টটি লুকানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

এরপর খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক উইলিয়াম অ্যাডাম ১৮৩৫-৩৮ সালে বিহার ও বাঙ্গলায় অনুরূপ একটি সার্ভে করেন, যেখানে উনি এক লক্ষ গ্রামীণ বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তার মতে, প্রতিটি জেলায় প্রায় ১৮০০টির মতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গলা ও বিহার প্রেসিডেন্সিতে প্রাক্তন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম অ্যাডামের করা এই সার্ভে প্রসঙ্গে 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে বলেছেন...

''রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদরি অ্যাডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় বাঙ্গলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল, দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এছাড়া প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাজ থেকে। আমার প্রথম অক্ষরপরিচয় আমদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে। মনে আছে এই দালানের নিভৃত খ্যাতিহীনতা ছেড়ে আমার সতীর্থ আত্মীয় দুজন যখন অশ্বরথযোগে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন তখন মানহানির দুঃসহ দুঃখে অশ্রুপাত করেছি এবং গুরুমশায় আশ্চর্য ভবিষ্যৎদৃষ্টির প্রভাবে বলেছিলেন, ওইখান থেকে ফিরে আসবার ব্যর্থ প্রয়াসে আরও অনেক বেশি অশ্রু আমাকে ফেলতে হবে। তখনকার প্রথম শিক্ষার জন্য শিশুশিক্ষা প্রভৃতি যেসকল পাঠ্যপুস্তক ছিল, মনে আছে, অবকাশকালেও বার বার তার পাতা উলটিয়েছি। এখনকার ছেলেদের কাছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হব, কিন্তু সমস্ত দেশের শিক্ষা-পরিবেশনের স্বাভাবিক ইচ্ছা ওই অত্যন্ত গরিব-ভাবে-ছাপানো বইগুলির পত্রপুটে রক্ষিত ছিল— এই মহৎ গৌরব এখনকার কোনো শিশুপাঠ্য বইয়ে পাওয়া যাবে না। দেশের খাল-বিল-নদী-নালায় আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্বধারণের নিরক্ষতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।''

১৮২০ সাল বম্বে প্রেসিডেন্সিতে করা সার্ভের ভিত্তিতে জানা যায়, সেখানে এমন কোনো গ্রাম ছিল না যেখানে বিদ্যালয় ছিল না এবং বড়ো গ্রামগুলিতে একের বেশি বিদ্যালয় ছিল।

পরবর্তী সময়ে ১৮৮২ সালে ড. লিটনার-এর পঞ্জাবে তার নিজের করা সার্ভে ও সরকারের পুরোনো কিছু তথ্য ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষার এই বিস্তৃতি প্রমাণ

করে। লিটনার খুব স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লিটনার ব্রিটিশ-আধিকারিক হলেও ইংরেজ ছিলেন না। ইংরেজরা আরও বেশি অর্থের লোভে রাজস্ব মুক্ত মন্দিরের জমি ৩৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশতে নামিয়ে আনে যাতে মন্দিরের সাহয্যে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থার শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। হলোও তাই। প্রায়োজনীয় অর্থের অভাবে গুরুকুল ও পাঠশালাগুলি ধুঁকতে থাকলো।

এরপরে ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে প্রবেশ ঘটলো থমাস ব্যাবিংটন এডওয়ার্ড মেকলের, যাকে সনাতন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের প্রধান স্থপতি বলা যায়। মেকলে ছিলেন উলিয়ম বেন্টিঙের আইনসচিব। ১৮৩৫-এর ফেব্রুয়ারিতে মেকলেসাহেব গভর্নর ইউলিয়াম বেন্টিঙ্ককে সনাতন ধারার ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করেন। মেকলে প্রস্তাবে বলেন, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া সংস্থার পক্ষে এত বিপুল সংখ্যক জনগণকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা অসম্ভব। মেকলে চেয়েছিলেন সমাজের উচ্চবর্গের ভারতীয়দের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা নিম্নবর্গের মানুষের মধ্য চুঁইয়ে পড়বে (Infiltration Theory) আর এমন এক শ্রেণীর ভারতীয় তৈরি হবে যারা বর্ণে ও রক্তে হবে ভারতীয়, কিন্তু ভাবনা ও রুচিতে হবে ইউরোপীয় ('Indian in blood & colour, but English in tastes, in opinions, and in morals and intellect')। ভারতীয় ভাষা না জেনে, ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দেশের সাধারণ মানুষের সমস্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত না হয়েই মেকলে বলেছিলেন, 'ইউরোপের একটি ভালো গ্রন্থাগারের একটি বই ভর্তি তাকই ভারত ও আরবের সমগ্র সাহিত্যের সমান'। মেকলে জানতেন যে তার বৌদ্ধিক উপনিবেশিকতার এই নীতিটি এক ঢিলে দুই পাখি মেরে ফেলবে। একদিকে ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় অনুশীলনকে অবজ্ঞার চোখে দেখবে এবং খুব সহজেই ইংরেজি এবং ব্রিটিশদের আধিপত্য তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হবে আর নিজেরা তাদের সস্তা কেরানিতে পরিণত হবে। মেকলের প্রস্তাব মেনে বেন্টিঙ্ক ১০ জুলাই 'English Education Act'-এর মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষাকে সরকারি নীতিরূপে ঘোষণা করেন।

এমনিতেই যখন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যশালী শিক্ষাব্যবস্থা আর্থিক ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে ক্ষীয়মাণ ছিল, তখন ইংরেজরা সুকৌশলে 'ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা' চালু করলো। এই শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করা কিছু অবস্থাপন্ন পরিবার ছাড়া সাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবর্ষের শিক্ষার হার কমিয়ে দিল।

গান্ধীজী সনাতন ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক সুন্দর বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেন এবং আশার বাণী শোনান যে, পরবর্তীকালে আমরা সেই শিক্ষাব্যবস্থাকেই পুনরুদ্ধার করবো। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা পেলাম এমন এক প্রধানমন্ত্রী যিনি ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতে লজ্জাবোধ করতেন। ফলে গান্ধীজীর নাম ৭০ বছর ধরে শুধুই ভোট বৈতরণী পার হওয়ার কাজে লাগলো কিন্তু শিক্ষা নিয়ে গান্ধীজীর পরিকল্পনা প্রাধান্য পেল না।

১৯৩১ সালে গান্ধীজী শিক্ষার বিষয়টি উত্থাপিত করে, ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য দায়ী করেছিলেন। ব্রিটিশরা গান্ধীজীর অভিযোগ স্বীকার করেনি। গান্ধীজী ১৮২৬ সালে করা সেই সার্ভের কথা জানতেন যা ইংরেজরা ব্রিটিশ লাইব্রেরির আর্কাইভে যক্ষের ধনের মতোই লুকিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীকালে এটি আবিষ্কার করেন ধর্মপাল নামে এক ব্যক্তি এবং তিনি এই তথ্যগুলো 'The Beautiful Tree' নামক একটি বইয়ে প্রকাশ করেন। শ্রী ধর্মপাল এই তথ্যগুলি জনসমক্ষে আনার জন্যই ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে কাজে যোগদান করেন এবং রিপোর্ট পাওয়ার পরে লাইব্রেরিতে বসে দীর্ঘ সময় ধরে এই রিপোর্ট টুকে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীকালে বই আকারে প্রকাশ করেন। ধর্মপাল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪ অক্টোবর, ২০০৬-এ মহারাষ্ট্রের সেবাগ্রামে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ-সহ বেশ কিছু স্বনামধন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। সর্বদা সাধারণ খাদি পরিহিত এই মানুষটিকে ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে একটি 'খোলা চিঠি' লেখার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল।

এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁকে 'Cattle Commission'-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। তিনি সারাজীবন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যশালী শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা যে প্রকৃতপক্ষেই 'একটি সুন্দর বৃক্ষ' ইংরেজরা তা বুঝতে পেরেছিল। এজন্য তারা এই বৃক্ষের মূল খুঁজে তাকে উপড়ে ফেলেছিল। একটি জাতির পরাজয়ের ফলে বিজিত জাতির মধ্যে যে শুধুমাত্র বিভাজন ঘটে তা নয়, সেই জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডারটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংরেজরা এই দুটি কাজই সুনিপুণভাবে করেছিল।

ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে মেকলে কতটা সফল হয়েছিলেন বোঝা যায়। সত্যিই ভারতবর্ষে এমন এক শ্রেণী তৈরি হয়ে গিয়েছে যারা দেশীয় সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ইতিহাসকে মনে রাখেনি। ভারতবর্ষে মেকলের মানসপুত্ররা লাল চশমা খুলে রেখে কখনোও সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যশালী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেননি।

বর্তমানের তথ্য অনুযায়ী, ভারতবর্ষে ৫, ৯৭,৪৮৩টি গ্রাম ও ৭৯৩৩টি শহর আছে। যদি প্রত্যেক গ্রামে একটি করে মোট প্রায় ৬ লক্ষ মন্দির থাকতো এবং সেই মন্দিরগুলি প্রাক-ব্রিটিশ যুগের মতোই স্বনিয়ন্ত্রিত হতো, তাহলে সেই সুন্দর বৃক্ষটি আজও আমাদের কয়েক হাজার বছরের সংস্কৃতির ছায়াতলে জ্ঞানের ফল দিয়ে সমৃদ্ধ করতো। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মেকলীয় বিষ আজও আমাদের জাতিকে 'ভারতীয়ত্ব' থেকে ক্রমশ দূরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে যখন তাদের নিজস্ব শিকড় সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় বা যখন তারা নিজের বা পূর্বপুরুষদের জন্য লজ্জিত হয়। একটি জাতি তখনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যখন তাঁরা তাদের নিজস্ব জীবনযাপন, তাদের দর্শন, নীতি, চিন্তাস্রোত ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

গ্রিক, রোমের মতো প্রাচীন সভ্যতাগুলি নিজস্ব জীবনযাত্রায়, নিজস্ব প্রজ্ঞায় বিশ্বাস হারিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শন গ্রহণ করে আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। যদি আমরা সত্যিই একটি জাতি হিসেবে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে না চাই, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মেকলীয় ভাবধারা থেকে বের করে সেই সুন্দর বৃক্ষটিকে আবার ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করতে হবে। ❙

পশ্চিমবঙ্গ এখন রাজনৈতিক পিশাচদের ডেরা

অগ্নিশিখা নাথ

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে গড়া বাঙ্গালি হিন্দুদের একমাত্র নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বাসভূমি 'পশ্চিমবঙ্গ'। তাঁর সৃষ্ট সাধের বাঙ্গলা। কিন্তু বিগত চার দশক ধরে সেই বাসভূমি যে একটু একটু করে জেহাদি ষড়যন্ত্রের শিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ যে আর বাঙ্গালি হিন্দুর পক্ষে নিশ্চিন্ত বা নিরাপদ কোনোটিই নয় তা বোধ হয় পরিষ্কার হলো ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর, আজ থেকে ঠিক ২ মাস ৫ দিন আগে। এইটুকু সময়কালের মধ্যে প্রায় ৪২ জন প্রাণ হারিয়েছেন ও লক্ষাধিক মানুষ আহত, ১৫ হাজার মানুষ ঘরছাড়া, হাজার হাজার বাড়িঘর, দোকান লুট হয়েছে। আর চলছে নৃশংস ভয়াবহ নারী নির্যাতন। একজন নারী হয়ে যা শুনলেই শিউরে উঠতে হয়। মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে আবার প্রত্যক্ষ করছে আমারই মা-বোনেরা। কী অসহায় লাগে নিজেকে, যখন দেখি প্রশাসন নিশ্চুপ নির্বাক হয়ে এই সব পৈশাচিক ঘটনার সাক্ষী থাকছে। আরও অসহায় বোধ করি তখন যখন ৫ মে মুখ্যমন্ত্রীর পদে সেই একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী, জেহাদি সন্ত্রাসের মতদকারী একজন স্বার্থান্বেষী নারীকে তৃতীয়বার শপথ নিতে দেখি। রাজনৈতিক রঙের আড়ালে যে জেহাদি সন্ত্রাসের নারকীয় অত্যাচার ভোগ করছে পশিমবঙ্গের নারী সমাজ, তারই কিছু ঘটনাবলী তুলে ধরব আপনাদের সামনে।

২ মে ভোটের ফলাফল বেরোনোর আগেই বিকেল ৪টের সময় বেলেঘাটা বিধানসভায় বিজেপি মহিলা মোর্চার মণ্ডল প্রেসিডেন্ট শংকরী দাসের বাড়িতে হামলা করা হয়। তার বাড়ি ও তার বাবা-মায়ের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড মারধরও করা হয় তাকে। তারা সেখান থেকে কোনোরকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। ওইদিন সন্ধ্যেবেলা পশ্চিম বেহালার বিজেপি কর্মী সুস্মিতা দাসের বাড়ির সামনে পর পর বোমা

পশ্চিমবঙ্গের এই বর্বরোচিত নৃশংসতার উত্তর কে দেবে? সারা বিশ্বের মানুষ যখন এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমেছে, তখন দেখুন, প্রথম শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা কী নির্বিকার।

বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বোরেলেই প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ১২ বছরের মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে কোনোরকমে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বাঁচেন। আজও কিন্তু তিনি ঘর ছাড়া। এরকম শত শত উদাহরণ দিতে পারি হিন্দু মহিলা যারা আজও তাদের শান্তির নীড়ে ফিরতে পারেনি, ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপরাধ একটাই তারা হিন্দু বাঙ্গালি। যে কদর্য নোংরা রূপ শাসক দলের হার্মাদবাহিনী দেখাচ্ছে তার আরও কিছু নমুনা দিই।

শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, গণধর্ষণ চলছে দিনের পর দিন। সাত হাজার কেস সামনে এসেছে, তবে প্রত্যক্ষদর্শী যারা তাদের জবানবন্দিতে সংখ্যাটি এর অনেক গুণ বেশি। দিনের আলোতে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে হিন্দু মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনার বেশ কিছু অঞ্চলে তৃণমূলি হার্মাদরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রশাসনের সামনে। সন্দেশখালিতে এক বিজেপি কর্মীর ১৩ বছরের মেয়ে ও স্ত্রীকে তার সামনেই গণধর্ষণ করা হয়। বারুইপুর পূর্বতে পিয়ালি বেগমপুর কলোনির বাসিন্দা এক মহিলা বিজেপি কর্মীকে ইট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া হয় পরনের জামাখানি, সকলের সামনেই বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানি করে দুষ্কৃতীরা। কোথাও আবার হিন্দু মেয়েদের বিবস্ত্র করে 'খেলা হবে' গানের সঙ্গে নাচতে বাধ্য করা হয়। ষাট বছরের বৃদ্ধা বলছেন যে, তার ছয় বছরের নাতির সামনেই তাকে গণধর্ষণ করে তৃণমূলি নরপিশাচরা।

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার সেই ১৭ বছরের ফুটফুটে মেয়ে শাশ্বতী জানার কী অপরাধ ছিল যে একদল নরখাদক তার দেহটাকেনিয়ে পৈশাচিক খেলা করার পরও প্রাণে মেরে দিল? উত্তর ২৪ পরগনার শোভারানি মণ্ডলের কী অপরাধ ছিল যে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে গণপিটুনিতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হলো? এই বর্বরোচিত নৃশংসতার উত্তর কে দেবে? সারা বিশ্বের মানুষ যখন এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমেছে, তখন দেখুন, প্রথম শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা কী নির্বিকার। আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গের নারীদের এই আর্তনাদ মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে, এখন সুবিচারের অপেক্ষায় রাজ্যবাসী।

নিঃসঙ্গ, তবু ছিলেন প্রাণচঞ্চল

নিলয় সামন্ত

দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। ফলে মৃত্যু অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু কিছু কিছু মৃত্যু মেনে নিতে খারাপ লাগে। কেশব দত্ লাহোর থেকে তখনকার বোম্বাই হয়ে কলকাতায় আসার পর বাঙ্গালির খুবই কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। এতটাই কাছের যে 'দত্' পদবিটা বাঙ্গালির 'দত্ত' হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর দত্ ভালো সাঁতারু ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুশীলা খেলাধুলো না করলেও ছিলেন ক্রীড়ানুরাগী। ওঁদের ৪ পুত্রের প্রথমজন রমেশ শুরু থেকেই চলে যান বাস্কেটবলে। অবিভক্ত পঞ্জাব দলের অধিকানায়কও হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র বিশেষের আগ্রহ ছিল টেবিল টেনিসে। যৌবনে বেশ নামও করেছিলেন। তৃতীয় যোগেশের প্রিয় খেলা ছিল হকি। চতুর্থ কেশব শৈশবে বিভিন্ন খেলায় আগ্রহ দেখালেও একটি ঘটনা হকির প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল।

১৯৪৫ সালে জাতীয় হকিতে অবিভক্ত পঞ্জাবের হয়ে প্রথম খেলেন। ১৯৪৬-এ কলকাতায় জাতীয় হকিতে খেলেননি। ১৯৪৭-এ জাতীয় হকির আসর বলেছিল বোম্বাইয়ে। লাহোর থেকে তখনকার অবিভক্ত পঞ্জাবের হয়ে খেলতে এসেছিলেন কেশব। পঞ্জাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। দলের অধিনায়ক ছিলেন পরবর্তীপর্বে ভারতের অন্যতম সেরা কোচ গুরচরণ সিং বোধি। দেশ ভাগ হওয়ার পর ১৯৪৭-এর শেষ দিকে ভারতীয় দল গিয়েছিল পূর্ব আফ্রিকা সফরে। যে দলের অধিনায়ক ছিলেন ধ্যানচাঁদ। আরও কয়েকজন তরুণের সঙ্গে সেই ভারতীয় দলে সুযোগ করে নিয়েছিলেন কেশবও। সেটা দেশভাগের আগের সেই জাতীয় প্রতিযোগিতায় ভালো খেলার জন্যই। দেশভাগের পর লাহোরের পর্ব চুকিয়ে চলে আসেন বোম্বাইয়ে। বড়দা রমেশ বাস্কেটবল খেলার জন্য বোম্বাই কাস্টমসে চাকরি পেয়ে ওই শহরেই থাকতেন। বড়দার কাছে থাকতে শুরু করেন কেশবও। ১৯৪৭-এর সেই দ্বিতীয় পর্বে বোম্বাইয়ে এসে চুটিয়ে ব্যাডমিন্টনও খেলতেন। ওই সময় বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নও হন। যার মধ্যে একটি প্রতিযোগিতায় হারিয়েছিলেন প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ভি এ মাদগাভাকারকে। ওই সময় কেশব দত্ত নিজেও ঠিক করতে পারছিলেন না, কোনটা রাখবেন আর কোনটা ছাড়বেন।

ওই ভাবনার মাঝেই চলে আসে ১৯৪৮-এর জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা। অলিম্পিক ইয়ার। ফলে সেবার জাতীয় প্রতিযোগিতার আলাদা গুরুত্ব ছিল। কেশব তখন বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়। বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও দুর্দান্ত খেলেছিলেন কেশব। ফলে অলিম্পিকের প্রস্তুতি শিবির ডাক পান। হকি না ব্যাডমিন্টন, সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আর সমস্যা হয়নি। ব্যাডমিন্টনকে পুরোপুরি বিদায় না জানালেও, এবার হকির দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েন। তার ফলও পান। লন্ডন অলিম্পিকে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর সেটাই ছিল প্রথম অলিম্পিক। ফলে ভারতীয় দলের কাছে অন্যরকম চ্যালেঞ্জ ছিল। সেই চ্যালেঞ্জ জিতেছিলেন কেশবরা। তারপর আরও একটি অলিম্পিকে খেলেছেন মাঝমাঠের খেলোয়াড় কেশব দত্ত। ১৯৫২-র সেই হেলসিঙ্কি অলিম্পিকেও সোনাজয়ী তিনি। তখন তিনি আর বোম্বাইয়ের খেলোয়াড় নন। তার ৩ বছর আগেই কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় প্রথমে চাকরি সূত্রে খেলেছেন পোর্টের হয়ে। পরে তিনি পাকাপাকি মোহনবাগানের। ওঁকে পোর্ট থেকে মোহনবাগানে নিয়ে এসেছিলেন অভিনেতা জহর গাঙ্গুলি। তিনি ছিলেন তখন মোহনবাগানের হকি সেক্রেটারি। পোর্ট ছেড়ে তখন চাকরি করতেন ব্রুক বন্ডে।

পূর্ব আফ্রিকা সফর থেকেই কে ডি সিং বাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল কেশবের। পরে সেই বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়েছে। ১৯৫২-র অলিম্পিকে বাবু ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। কেশব দত্ত সহ-অধিনায়ক। ১৯৭২-এ মিউনিখ অলিম্পিকে ভারতের কোচ ছিলেন বাবু। আর ম্যানেজার কেশব দত্ত। কলকাতায় এসেও হকির পাশাপাশি চালিয়ে গিয়েছেন ব্যাডমিন্টনও। তখন অবশ্য আর টানাপোড়েনে ছিলেন না। হকিই হয়ে উঠেছিল তাঁর একনম্বর খেলা। দুইয়ে ব্যাডমিন্টন। কলকাতায় চলে আসার পরের বছরই, ১৯৫০ সালে রাজ্য ব্যাডমিন্টনে ত্রিমুকু জিতেছিলেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে রাজ্য প্রতিযোগিতার পুরুষ সিঙ্গলসের ফাইনালে হারিয়েছিলেন রাজ্যের তখনকার সেরা তারকা মনোজ গুহকে। ডাবলসের ফাইনালে হারিয়েছিলেন মনোজ গুহ-সুনীল বসুকে। কেশবের সঙ্গী ছিলেন বিশু ব্যানার্জি। মিক্সড ডাবলসে কেশবের সঙ্গী ছিলেন মিস হমাম। ফাইনালে ওঁরা হারিয়েছিলেন গজানন্দ হেমাডি-মিস উডকে। অনেক বছর পর বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক তথা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সুনীল বসু বলেছিলেন, 'কেশব ব্যাডমিন্টনকে আরেকটু গুরুত্ব দিলে হকির মতোই দেশের হয়ে খেলতে পারত।'

শৈশব থেকেই কেশব ছিলেন প্রাণচঞ্চল। অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন সেই মেজাজটাই। ছিলেন যথার্থ ভদ্রলোক। শেষ বছরগুলোতে ওই মানুষটিকেই গৃহবন্দি হয়ে পড়তে হয়েছিল। হকি স্টিকের বদলে সব সময়ের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল লাঠি। ▯

প্রজাপতির উপদেশ—দ-দ-দ

দেবতা, দানব ও মানুষ তিনেরই পিতা হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনজনই পিতার আশ্রমে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে সাধনা করছে। বহুদিন পর যখন তাদের তপস্যার কাল শেষ হয়ে গেল তখন দেবতারা একদিন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বললেন, পিতা,এবার আমাদের

উপদেশ দিন। দেবতাদের উপদেশ দিতে গিয়ে প্রজাপতির মনে হয়েছে সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবতারা আত্মবলে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাদের এমনই শক্তি যে, ইচ্ছামতো জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য সজহভাবেই তারা ভোগ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে যদি দেবতারা ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগের জন্য সেদিকেই ধাবিত হয়, তাহলে তারা যে শক্তি অর্জন করেছে তার অপপ্রয়োগ করা হবে। ফলে দেবতারাই শুধু ভোগবিলাসের অধিকারী আর অন্যেরা হবে বঞ্চিত। তাতে সৃষ্টির ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই ভোগের আকাঙ্ক্ষা যেন দেবতাদের সর্বগ্রাসী করে তুলতে না পারে তার জন্য চাই ইন্দ্রিয়সংযম বা আত্মসংযমের উপদেশ। এরকম গভীর ভাবনা ভেবে প্রজাপতি তাদের কাছে একটিমাত্র অক্ষর উচ্চারণ করলেন– 'দ'। প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বুঝলে তো আর কী বুঝলে? দেবতারা বলল, আপনি আমাদের এই উপদেশই দিলেন যে তোমরা দম্যৎ অর্থাৎ দান্ত হও। আমাদের ইন্দ্রিয় সংযম, আত্মসংযম করার উপদেশই দিলেন। শুনে প্রজাপতি খুবই খুশি হলেন

তারপর মানুষেরা পিতা প্রজাপতির কাছে এসে বলল প্রভু, আপনি আমাদের উপদেশ দিন। প্রজাপতি তাদের দেখেই বুঝলেন বিত্ত-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ সুজলা-সুফলা পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যায় লোভী, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। লালসা মুগ্ধ হয়ে নিজেদের ভোগসুখের জন্য ও ধনসম্পদ বানানোর জন্যই বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত হয়ে থাকবে। অন্যের দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগও তারা নেবে না। কারণ এটাই তাদের স্বভাব। এই স্বভাব নিয়েই তারা পৃথিবীতে জন্মেছে। সুতরাং সেই ভাব যদি বলবান হয় তাহলে ত্যাগ করে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে না আসাই স্বাভাবিক। যার ফলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হবে। বিশ্বসৃষ্টিতে দেখা দেবে বৈষম্য। তাই মানুষকে শেখানো দরকার দান কর। আগে ত্যাগ করে তারপর ভোগ কর। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নাও। প্রয়োজনের বেশি সঞ্চয় করা অনুচিত। অন্যের বিপদে তার পাশে দাঁড়াও। তাকে সাহায্য কর। প্রকারান্তরে মানুষের হৃদয়কে প্রসারিত করা ও সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। এ সকল ভাবনা ভেবেই প্রজাপতি তাদের বললেন, 'দ'। প্রজাপতি তাদের কাছে জানতে চাইলন তোমরা বুঝলে তো? মানুষেরা বলল হ্যাঁ আমরা বুঝলাম। আপনি আমাদের বলেছেন দত্ত অর্থাৎ দান কর। শুনে প্রজাপতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বুঝছ। এরপর সবার শেষে এর দানবেরা। তারা বলল, পিতা এবার আপনি আমাদের উপদেশ দিন। প্রজাপতির দানবদের দেখে মনে হয়েছিল দানবেরা স্বভাবগতই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন আর শারীরিক শক্তির উন্মত্ততাতেই সব সময় ব্যস্ত। অন্যের ওপর অকারণে অত্যাচার ও নির্যাতন করে শান্তি নষ্ট করাই তাদের অন্তরের সহজাত প্রবৃত্তি হতে পারে। আর সেই স্বভাব নিয়েই যদি তারা চলে তাহলে সমাজ-সংসারের সুস্থিতি বিনষ্ট হবে। অপপ্রযোগ হবে শক্তির। সুতরাং দানবদের শক্তির উচ্ছৃঙ্খলতাকে বেঁধে রাখতেই হয়তো প্রজাপতি তাদের উপদেশ দিলেন সেই একই অক্ষর– 'দ'। তারপরই প্রজাপতি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তোর কী বুঝলে? অসুরেরা বলল, আপনি আমাদের বলতে চাইছেন– দয়ধ্বম্ অর্থাৎ দয়া কর। প্রজাপতি তাদের উত্তর শুনে প্রসন্ন হয়ে বললেন, হ্যাঁ ,তোমরা ঠিকই বুঝেছ।

আজও যখন আকাশে মেঘের গর্জন হয়, তখন জগৎপিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার সেই অনুশাসনই যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়, দ—দ—দ..... দম্যৎ– দত্ত—দয়ধ্বম্।

ভারতের বিপ্লবী

অনন্তহরি মিত্র

অনন্তহরি মিত্র ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী। তিনি বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে কৃষ্ণনগরে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ১৯২৫ সালের ১০ নভেম্বর তাঁকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজ পুলিশ। আলিপুর জেলে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ভূপেন ব্যানার্জিকে হত্যার জন্য ১৯২৬ সালে তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

- সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি।
- সালফারকে জ্বলন্ত পাথর বলা হয়।
- বিছুটির পাতায় ফার্মিক অ্যাসিড থাকে।
- মশার কামড়ে ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায়।
- রান্নার সময় তাপের কারণে ভিটামিন-সি নষ্ট হয়ে যায়।
- ত্রিপুরা রাজ্যের তিনদিকে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে।
- আকবরের সভাসদ বীরবলের আসল নাম মহেশ দাস।

ভালো কথা

করোনার শিক্ষা

মহামারী করোনা শুরু হতেই নানান বিধিনিষেধ যেমন, বারবার হাত ধোয়া, চোখে-মুখে হাত না দেওয়া, বাইরে থেকে এলে ভালোভাবে হাত-পা ধোয়া, একজনের থেকে আর একজন দূরত্ব পালন করা, বাইরের জিনিস না খাওয়া ইত্যাদিতে খুবই খারাপ লাগত। তারপর ধীরে ধীরে এটা যেন স্বভাবে পরিণত হয়ে গেল। এখনও আমাদের বাড়িতে এই নিয়ম চলছে। এখনও প্রতিদিন আমাদের পুরো বাড়ি সকালে সাবানজল দিয়ে ধোয়া হয়। কেউ বাইরে থেকে এলে নীচেই জুতো রেখে হাত-পা ধুয়ে তারপর উপরে উঠতে হয়। ঠাকুমা প্রায়ই বলেন, করোনা মানুষের অনেক কিছুই ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু অনেক ভালো শিক্ষা দিয়েছে। এটা সারা জীবন পালন করতে হবে।

বিপাশা দাস, দ্বাদশ শ্রেণী, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল জ ল ম ঙ্গ

(২) ল চৈ ন্য ত ঙ্গ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ক র দা বি য় দ হ্ন

(২) না কা ত স্বা চে ধি র

৩ মে সংখ্যার উত্তর

(১) পরাগমিলন (২) সাহিত্যসাধনা

৩ মে সংখ্যার উত্তর

(১) মহাকাশবিজ্ঞান (২) নিয়মভঙ্গকারী

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯। (২) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ। (৩) আকাশ বাসফোর, খরমুজাঘাট, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ। (৪) সুদীপ মহান্তি, মানবাজার, পুরুলিয়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

সাইকেলে চড়ে বিশ্ব পর্যটনের গৌরব নিয়ে ধ্রুব

কৌশিক রায়

প্রস্তরকঠিন উদ্যম আর প্রতিজ্ঞাকে সঙ্গী করে, নিজের বিশ্বস্ত বাইসাইকেল নিয়েই গোটা পৃথিবীতে এর মধ্যেই, পাহাড়-নদী-সমুদ্র পেরিয়ে প্রায় ১৫ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। অসমসাহসী এবং ভূপর্যটক হওয়ার বাসনাকে নিজ হৃদয়ে স্বযত্নে লালন করা, ৫১ বছর বয়সের সেই 'চিরযুবক'টির নাম হলো ধ্রুবো বোগরা। এর মধ্যেই উত্তর মেরুবৃত্ত থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত, মার্কিন দেশের আলাস্কার ডেডহর্স নামক তুহিন তুষার তেপান্তর থেকে আন্দিস পর্বতের দুর্গম কোলে অবস্থিত, দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাষ্ট্রের অন্তর্গত উরুবাম্বা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা, দু-চাকার 'রথে' করে ঘুরে ফেলেছেন সেনাবাহিনীর অফিসারের ছেলে এবং মুম্বইয়ে একটি বহুজাতিক বাণিজ্য বিপণন সংস্থার হয়ে কর্মরত ধ্রুব বোগরা।

কলেজের পড়াশোনার পাট চুকোবার পর প্রিয় হবি এবং ব্যায়াম-বাইসাইকেল চালানোর কাজটিতে ইস্তফা দিতে হয় ধ্রুব বোগরাকে। তখন তিনি হয়তো ভাবেননি একদিন প্রায় একনাগাড়ে ১৪ মাস ধরে তিনি আবার বাইসাইকেলে করে চষে ফেলতে পারবেন প্রায় গোটা পৃথিবী। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়, উত্তরপ্রদেশের মথুরাতে বাবার সেনা-ছাউনির আশেপাশে, সবুজ ঘাসজমিতে বাইসাইকেল চালানোর যে আনন্দ পেয়েছিলেন ধ্রুব বোগরা, সেই অভিজ্ঞতাটাই যে বিশ্ব-দর্শনে কাজে লেগেছে সেটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন তিনি।

২০১১ সাল থেকেই জ্যাক অ্যান্ড জোনস ও ভেরো মোডা কোম্পানি দুটির হয়ে কাজ করার সময় মুম্বইতে প্রতিদিন ভোর চারটেয় উঠে ধ্রুব ও তাঁর বন্ধুরা, সাইকেল চালাতে বেরিয়ে পড়তেন 'অচেনার আনন্দ'কে আস্বাদন করার জন্য। ছেলেবেলায় দিনে ৩০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়েছেন ধ্রুব। সম্প্রতি, বাইসাইকেলে করে বিশ্বভ্রমণ প্রতিদিন গড়ে ১৫০ কিলোমিটার করে দূরত্ব অতিক্রম করেছেন তিনি। পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদি পর্বতমালার বন্ধুর, পাকদণ্ডী পথে, আন্দিস পর্বতমালার গহন অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে বাইসাইকেল চালাতে কোনও অসুবিধা হয়নি ধ্রুবর। এক্ষেত্রে পিচ্ছিল ও পার্বত্য পথ, ঝড়-বৃষ্টি, প্রখর রোদ, হাড়কাঁপানো শীতের বাধাকে অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। ভয় ও আতঙ্ককে পরাস্ত করে সাফল্যের মুকুট পরাটাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল হার-না-মানা ধ্রুবর কাছে।

২০১৫ সালে আলাস্কার বরফঢাকা রাজ্যে বাইসাইকেল চালানো থেকে সর্বপ্রথম বিশ্বভ্রমণ শুরু হয় আজন্ম ভ্রমণপিয়াসী ধ্রুব বোগরার। হিমাচল প্রদেশের মানালি থেকে খারদুংলা গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত বিস্তৃত, বিশ্বের সর্বোচ্চ, মোটরযানবাহী রাস্তাতেও অক্লেশে বাইসাইকেল চালিয়েছেন। এই সময়ে সাইক্লিং করার কষ্ট ও সাফল্যই তাঁকে আলাস্কা ও আন্দিস পর্বতে বাইসাইকেল চালাতে উৎসাহিত করেছিল।

এরপর, ধ্রুব বোগরার পাখির চোখ ছিল গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর বিচারে বিশ্বের দীর্ঘতম বাইসাইকেল চালানোর রাস্তা— প্যান আমেরিকান হাইওয়ে দিয়ে সাইকেল চালানো। ১৪টি দেশ এবং বিভিন্ন জলবায়ু মণ্ডলের মধ্য দিয়ে গেছে এই সুদীর্ঘ মহাসড়কটি। এই রাস্তায় চলতে গিয়ে বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক পথ ৬৬২ কিমি দীর্ঘ ডাল্টন হাইওয়ে পেরোন ধ্রুব বোগরা। এই রাস্তাটির প্রায় ৩৮৪ কিমি দূরত্বের মধ্যে নেই কোনও হোটেল, বিশ্রামাগার, শৌচালয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র। দক্ষিণ আমেরিকাতে ধ্রুব বোগরা যেতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় তিনটি জাতি— আজতেক, ইনকা ও মায়া-দের সুমহান সভ্যতা বিজড়িত ভেরাক্রুজ, লা-পাজ, তেনেখতিতলান, মাচু পিচু, ইউবাতান উপদ্বীপের মতো স্থানগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য। এই লাতিন আমেরিকা সফরে ধ্রুবর সঙ্গে ছিল ক্যানভাসের তাঁবু, রান্নার বাসনপত্র, কেরোসিন তেল, জামাকাপড় ও টাইটানিয়াম ধাতুর তৈরি কফি গমের মতো, প্রায় ৪০ কিলোগ্রামের মতো জিনিসপত্র। 'সার্লি ট্রোল' সংস্থার তৈরি সবরকম জলবায়ুতে টেকসই বাইসাকেলটিই তাঁর 'চবৈবেতি' মন্ত্রসাধনের নিত্যসঙ্গী। এই বাহনে করেই সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রায় ৭০০০ ফিট ওপরে পৌঁছতে পেরেছেন ভ্রমণ-ভক্ত ধ্রুব। আন্দিস পর্বতাঞ্চলে এবং কানাডার বরফে ঢাকা আলবার্টা অঞ্চলে সূর্যাস্তের সময় বিকাল ৪-টের সময় তাঁবু খাটিয়ে সন্ধ্যে ৭টার সময় শুয়ে পড়তেন পথক্লান্ত ধ্রুব। মেক্সিকোতে টাইফয়েড আর ব্রংকাইটিসে আক্রান্ত হন তিনি। তবুও রোগব্যাধির আক্রমণকে মোটেই পরোয়া করেননি। আর্কটিক থেকে আন্দিস এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে চেরোকি, ইনুইৎ, চুক্‌চি, নেনেৎ, নাভাজো, হোপি-দের মতো বিভিন্ন অবহেলিত, বঞ্চিত, কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোশহীন জনজাতির বিচিত্র জীবনধারা। □

ভরা শীতে অরুণাচলে

বিজয় আঢ্য

অরুণাচলে বিজয় যাচ্ছে শুনে প্রস্তাবটা করেই ফেললাম। অসমে একটা দুটো জায়গায় গিয়েছি বটে, কিন্তু অরুণাচলে তো যাওয়াই হয়নি। তাওয়াং, বমডিলা, পাশিঘাট, পরশুরাম কুণ্ড-র শুধু নামই শুনেছি। বিজয় পুরনো বন্ধু, তা প্রায় বছর পঞ্চাশেক। নাগপুরে আর এস এসের একটা ক্যাম্প করতে গিয়ে পরিচয়। নাগপুরেই বাড়ি। পদবি কুলকর্ণী। কেতাবি বিদ্যায় অর্থনীতিতে এম এ হলেও ওর ভালবাসার বিষয় হলো এডুকেশন এবং সেটা অবশ্য সামাজিক কর্মসূত্রে। সর্বভারতীয় শিক্ষা সংগঠন বিদ্যা ভারতীর ও এক নিবেদিত প্রাণ কর্মী। কিন্তু প্রস্তাব করলেই তো হলো না, এত কম সময়ের মধ্যে টিকিট জোগাড়ই সমস্যা। তা শেষেমেশ বিজয়ই একটা বন্দোবস্ত করে দিল। কলকাতা-গুয়াহাটির একটা প্লেনের টিকিট পাওয়া গেল। কথামতো নির্দিষ্ট দিনে গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে বিজয়ই আমাকে রিসিভ করল। শহরে ঢোকার আগে মন্দিরে গিয়ে মা কামাখ্যাকে দর্শনটা সেরে নিলাম।

এই মাঝ ডিসেম্বরে তাওয়াং যাচ্ছি শুনে অনেকেই ভ্রূ কোঁচকাল। কিন্তু ওই কথায় আছে না—'বেরিয়ে যখন পড়েছি ভাই.....'। আমাদের সঙ্গী আরও দুজন। শ্রীমান অশোকন। তরতাজা যুবক। কেরলের মানুষ। অরুণাচলে কস্তুরবা গান্ধী ফাউন্ডেশনের শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে আছেন। দ্বিতীয়জন চতুর্বেদীজী। বছর ষাটেক বয়স। মজবুত শরীর। উত্তরপ্রদেশের মানুষ হলেও কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন অসমের তেজপুরে আছেন। একটা ইনডোভা গাড়ি জোগাড় হয়েছে। সকাল আটটা নাগাদ জয় মা বলে বেরিয়ে পড়া গেল। ফাস্ট স্টপেজ তেজপুর। রাত্রিবাস তেজপুর সঙ্ঘ কার্যালয়ে।

ভোরবেলা রওনা দিলেও ভালুকপঙে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। অসম ও অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তে এই শহর। ভালুকপং থেকেই শুরু হচ্ছে অরুণাচল। অরুণাচলে প্রবেশ করতে হলে 'ইনার লাইন পারমিট' প্রয়োজন। সেইসব সরকারি কাজকর্ম সারতে কিছুটা সময় গেল। স্থানীয় এক পরিচিতজনের বাড়িতেই ছিল আহারাদির ব্যবস্থা। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেসব পাট চুকিয়ে রওনা দিলাম বমডিলার উদ্দেশে।

উত্তর-পূর্বের একদম শেষ সীমান্ত রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ। এই রাজ্যের দক্ষিণে অসম ও নাগাল্যান্ড, উত্তরে চীন, পূর্বে মায়ানমার আর

পশ্চিমে ভুটান। অরুণাচলকে বলা হয় 'উদিত সূর্যের দেশ'—'the Land of rising sun'. দুইটি পাহাড়ের মাঝে উদিত সূর্য—এই রাজ্যের প্রতীক চিহ্নও। আগে এই অঞ্চলের নাম ছিল নেফা (NEFA–North-East Frontier Agency)। ১৯৭২ সাল থেকে নাম হয় অরুণাচল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এটাই সবথেকে বড়ো রাজ্য। তবে লোকসংখ্যা খুব কম—প্রতি বর্গকিমিতে ১৩ জন মাত্র। আমাদের বাঙ্গলার বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের লোকেদের কাছে যা বিস্ময়ের বিষয়। চারদিকেই সবুজ চাদরে মোড়া পাহাড়, নদী, ঝরনা, অরণ্য। মাঝে মধ্যেই চোখে পড়বে হর্নবিল পাখি, গোরু ও মোষের মাঝামাঝি মতোন দেখতে মিথুন, শেয়ালের ল্যাজের মতো অর্কিড। এইসব দেখতে দেখতে বমডিলায় যখন পৌঁছালাম তখন রাতপ্রায় আটটা। ঘটনা হলো ভালুকপং হয়ে এলেও দেখা হয়নি সেখানকার সেসা অর্কিড সংরক্ষণাগার, নামেরি জাতীয় উদ্যান আর ভালুকপং দুর্গ। রাজা ভালুকের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে এখানে। প্রবাদ হলো—অসুররাজ বাণের পৌত্র রাজা ভালুক দশম শতাব্দীতে ভরোলি নদীর তীরে এই দুর্গ তৈরি করেছিলেন যা এখন প্রায় ভগ্নস্তূপ।

বমডিলাতে যে হোটেলটাতে উঠেছিলাম তার নাম লা হোটেল। হোটেলের মালিক পূর্বপরিচিত। কামেং জেলার তাসি শিরিং সেবা ভারতীর সেক্রেটারি। তবে রাতের আহার হোটেল নয়। বিজয়ের পরিচিত ওড়িশাবাসী বর্তমানে বমডিলা কলেজে কর্মরত এক অধ্যাপকের কাছে। নাম মনে নেই তবে পদবি পণ্ডা। পরিবারের কর্তা-গিন্নি দুজনেই বিজয়ের বন্ধু। গল্প বেশ জমেছিল। কথা হচ্ছিল বমডিলা নিয়ে। বমডিলা মানে বাঁশ। বাঁশের বাণিজ্যিক ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে নানা কথা। কিন্তু সুর কাটল আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের আবির্ভাবে। তার কথা—ড্রাইভারদের মদ খেতেই হবে। তা না হলে ড্রাইভারি-ই করা যাবে না। তাই এখনই কিছু টাকা তাকে দিতে হবে। না, তার এই দাবির মধ্যে শালীনতার অভাব ছিল না। তাদের কর্মজীবনের বাস্তব সত্যটাই সে বলেছে। দ্বিরুক্তি না করেই তাই তার দাবি মেটানো হলো।

বমডিলাতে দেখার মতো তেমন কিছু নেই। সকালে স্থানীয় সরস্বতী শিশু মন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতির বাড়িতে ব্রেকফাস্টের আমন্ত্রণ ছিল। ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী সাদর আপ্যায়ন জানালেন। তাদের শিশু পুত্রটির সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠল। তার স্ত্রী স্থানীয় পদ্ধতিতে চা করে খাওয়ালেন। এক ধরনের ফলও দিলেন যা শুধু অরুণাচলেই পাওয়া যায়। ফলের নাম কিবি (Kiwi)। স্থানীয় সরস্বতী শিশু মন্দিরের নাম মঞ্জুশ্রী শিক্ষা নিকেতন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যে বাড়ছে তা তিনি জানালেন। অরুণাচলে শিক্ষা বিস্তারে রামকৃষ্ণ মিশনের অবদানের কথা জানালেন। এই শিক্ষা বিস্তারের ফলে খ্রিস্টানদের ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা আর তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বস্তুত রাজ্যের মানুষই এই অরুণাচল-চীন সীমান্তের পাহারাদার। ১৯৬২-তে চীনের সেনারা যে বমডিলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল তা তারা ভোলেনি। আকা, মিজি, মনপা, বগুন ও পোরডুকপেন-সহ প্রায় তেত্রিশটি উপজাতি বিভিন্ন পাহাড়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বসবাস করলেও সবাই ভারতীয় হিসেবে গর্ব অনুভব করেন। ভারত সরকার যে চীনের হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে তাওয়াঙে দলাই লামাকে যাওয়ার অনুমতি দেয়, তার মূল কারণ হলো এটাই।

এরপর আমরা স্থানীয় শিশুমন্দির মঞ্জুশ্রী শিক্ষা নিকেতনে গেলাম। ৪৫ জন শিশু ছাত্র-ছাত্রী। সবাই স্কুলের পোশাক পরেই এসেছে। জাতীয় সংগীত গেয়ে স্কুল শুরু হলো। শুরুর আগের কিছুক্ষণ শিশুদের কলকাকলিতে স্কুলের পরিবেশটা ছিল আনন্দমুখর। সব স্কুলেই যেমন হয়। স্কুলের আচার্য-আচার্যাদের সঙ্গে পরিচয় হলো। এক-দুজন বাদ দিলে সবাই স্থানীয়। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল। তবে ভাষা এখানে ভারতীয় ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে উঠেনি। হ্যান্ডসেক নয়, হাতজোড় করে নমস্কারই রীতি। গুডমর্নিং নয়, নমস্তে বলাই চল।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গাড়ি তাওয়াঙের দিকে চলতে শুরু করল। ঘণ্টা দেড়েক পর পৌঁছালাম দিরাং-এ। বমডিলা থেকে ৪২ কিমি। এখানে চা খাওয়া গেল। এরপর পৌঁছালাম সিলা পাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৪ হাজার ১১৪ মিটার। বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম পাস বা পার্বত্য পথ যেখানে যানবাহন চলে। এখানে স্বচ্ছ জলের একটা প্রাকৃতিক হ্রদ আছে। লেকের খানিকটা অংশের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। অশোকনজী লেকের জমাট বরফের উপর দিয়ে একটু ঘুরে এল। যেমন খর রৌদ্র, আবার তেমন প্রচণ্ড বেগে হাওয়া বইছে। বেশ কিছুক্ষণ লেকের তীরে দাঁড়িয়ে চারদিকের প্রকৃতিকে প্রাণভরে দেখার চেষ্টা করলাম। এই লেকের তীরে দাঁড়িয়ে এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় বলেই বোধ হয় বিদেশিরা এর নাম দিয়েছে প্যারাডাইস লেক। লেকের তীরে একটা ছোট দোকান। আমিষ-নিরামিষ সব খাবারই পাওয়া যায়। আমরা পরোটা নিলাম। সঙ্গে চা। কাজ চলার মতো পেটটা ভরল। আবার চলা শুরু হলো।

বরফ ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল। পাহাড় থেকে ঝরনা নামতে নামতে মাঝপথে বরফ হয়ে গেছে। বটগাছের ঝুরির মতো সেই বরফের ঝুরি ঝুলছে। এমন অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কী আর গাড়িতে বসে থাকা যায়! সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। শুরু হয়ে গেল ক্যামেরার কারিকুরি। কে কত কাছ থেকে গিয়ে ক্যামেরা বন্দি করতে পারে তার প্রতিযোগিতা। আর এসব করতে গিয়ে সকলেরই পা পিছলাল। না, কেউ বাদ গেল না। সাবধানে পা টিপে টিপে গিয়ে নিজেও একবার পড়লুম। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে হাড়ে হাড়ে মালুম হলো বরফের দেশে পড়ার কী ঠেলা। হাটুর কাছটা একটু ফুলে গেল। ঘরে রুম হিটার জ্বালিয়ে শুরু হলো সেঁক দেওয়ার পালা। কিন্তু এসব তো ঠাহর হলো তাওয়াঙে পৌঁছে রাতের বেলা। এত কাছ থেকে এমন দৃশ্য দেখার সুযোগ আর কী হাতছাড়া করা যায়। যতটা পারি, দুচোখ ভরে শুধু দেখলাম। এবং এই দেখাটা যে শুধু দেখা নয়, একেবারে 'মরমে পসারিল', এতদিন পরেও সেটা অনুভব করতে পারি।

গাড়ি থামল যশবন্ত ঘরে। এখানে সেনাবাহিনীর একটা সেবা কেন্দ্র আছে। চা আর জল ফ্রি। তাওয়াংমুখী সব গাড়িই এখানে এসে থামছে। যশবন্ত ঘর আমাদের সেনার, ভারতবাসীর এক গর্বের জায়গা। আমাদেরই এক বীর সেনা নিজের প্রাণ বাজি রেখে অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরই স্মরণে এখানে তৈরি হয়েছে 'ওয়ার মেমোরিয়াল'। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় চতুর্থ গাড়োয়াল রাইফেলসের এই জওয়ান একা লড়াই করে চীনা লাল ফৌজকে ৭২ ঘণ্টা আটকে রেখে শেষে মৃত্যুবরণ করেন। পাহাড়ের যে বাংকারগুরি আড়ালে থেকে তিনি যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, সেই বাংকারগুলির ভেতরেও একবার ঢুকে দেখে এলাম। পাহাড়ের গায়ে

তৈরি বাংকার, ছোটো একটা ফোকর— এরই মধ্যে দিয়ে টার্গেটের উপর গুলি বর্ষণ। আমার বন্দুক হাতে নেওয়ার দৌড় সেই কলেজ লাইফে ১৯৬৪ থেকে ৬৬। এনসিসি আবশ্যিক। সেই ভোরবেলা বাড়ি থেকে ইউনিফর্ম পড়ে শিয়ালদার কিম ব্রাউনের ময়দানে। সেখানে ঘণ্টা তিনেক কুচকাওয়াজ সেরে কলেজ করে বাড়ি ফেরা। এসময়ে যাদের ছাত্রজীবন কেটেছে, কম-বেশি তাদের একই অভিজ্ঞতা। আমরা যারা এনসিসি ক্যাম্প করেছি তাদের হয়তো বা সামান্য একটু বেশি। এই যা! ভারতীয় সেনাবাহিনীর দীর্ঘ ইতিহাসে যশবন্ত সিংহ রাওয়াত এমন একজন সৈনিক (রাইফেল ম্যান), বীরগতি প্রাপ্ত হওয়ার পর যাঁর পদোন্নতি ঘটিয়ে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়েছিল এবং আজও বিশ্বাস করা হয় চীনসংলগ্ন ভারতের পূর্ব সীমান্তের ১৩ হাজার ফুট উচ্চ এই পার্বত্য প্রান্তে তিনি পাহারা দিয়ে চলেছেন। ১৯৬২ সালে ১৭ নভেম্বর চীনা সেনা আক্রমণ করলে তিনি একাই বিভিন্ন বাংকার থেকে এমনভাবে তাদের মোকাবিলা করেন যেন মনে হয় এখানে অনেক ভারতীয় সৈন্য রয়েছে। ৩০০-রও বেশি চীনা সৈন্য তাঁর গুলিতে নিহত হয়। শেষপর্যন্ত তিনি চীনা সেনাদের হাতে বন্দি হন এবং তাঁর শিরশ্ছেদ করে বিজয়ের স্মারক হিসেবে চীনা সেনারা নিয়ে যায়। যুদ্ধবিরতির পর যশবন্ত সিংহের সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে চীনা কমান্ডার যশবন্তের খণ্ডিত শির এবং তাঁর আবক্ষ ব্রোঞ্জের একটি মূর্তি ফিরিয়ে দেন। আজকের যশবন্ত ঘরে (মিউজিয়ামে) তা রাখা আছে। বিশ্বাস এতটাই প্রবল যে সেই ঘরে তাঁর জন্য শয্যাও আছে এবং তাঁর বুট রোজ পালিশ করা হয়। এই মিউজিয়াম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫ জন সেনা নিয়মিত পর্যায়ক্রমে উপস্থিত থাকে। বস্তুত এই মিউজিয়াম এখন হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তিনি 'যশবন্ত বাবা' হিসেবে পূজিত হয়ে থাকেন। লে-তে যাওয়ার পথে কারগিল ও দ্রাসে ভারতীয় সেনার এমন একটা মিউজিয়াম দেখেছিলাম। সেই মিউজিয়াম ছিল অবশ্য অনেক বেশি সুসজ্জিত। 'সিন্ধু উৎসব যাত্রা'-র পরিচালন কর্তৃপক্ষ আগে থেকে এই মিউজিয়াম দেখার ব্যবস্থা করায় আপ্যায়নও ছিল প্রশংসা করার মতো।

যশবন্ত সিংহকে নিয়ে আরও একটা লোককথা প্রচলিত আছে। যখন তিনি একাকী যুদ্ধ করছেন তখন তাঁর দুই মেয়ে—সেলা ও নুরা খুব গোপনে তাঁর কাছে খাবার পৌঁছে দিত। বাবার মৃত্যুর পর দুই বোনই আত্মহত্যা করে। এই দুই বোনের একজনের নামে হয়েছে সিলা পাস (Selea Pass), আরেকজনের নামে একটি জলপ্রপাতের নাম হয়েছে নুরা ফলস (Nura Nang)। ফেরার পথে এই জলপ্রপাত দেখে এসেছি। অনেকে উঁচু থেকে ভীমগর্জনে এই জলপ্রপাত নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

তাওয়াঙে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল। বমডিলা থেকে তাওয়াঙের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিমি.। তাওয়াঙের মার্কেটের উপরই একটা হোটেল। দোতলার দুটো ঘরে থাকার ব্যবস্থা। সকালে উঠে জানলা দিয়ে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ল, সেটা একটা ঘেরা মাঠ। এটাই তাওয়াঙের স্টেডিয়াম। সকালের জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য তাওয়াং মনাস্ট্রি। এই মনাস্ট্রির মানে বৌদ্ধ এই উপাসানালয়ের কথা আগেও শুনেছি। চীনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিব্বতীয় ধর্মগুরু দলাই লামা এখানে এসেছিলেন এবং ধর্মীয় সম্মেলনে বৌদ্ধ ভক্তদের দিশা নির্দেশও করেছিলেন। চারদিকে ঘেরা এক বিশাল চত্বর। তার একদিকে মূল মনাস্ট্রি। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রাচীনতম এই মনাস্ট্রি। সপ্তদশ শতকে ১৩৫ বর্গমিটার এলাকা নিয়ে এই মনাস্ট্রি নির্মাণ করেন সেরা লামা লডরে গিয়ালসো। তিনি ছিলেন পঞ্চম দলাই লামার সমসাময়িক। মন্দিরটি তিনতলা। সেখানে রয়েছে ২৮ ফুট উচ্চতার গৌতম বুদ্ধের ধ্যানময় মূর্তি। সেই বিশাল কক্ষটিতে এক গভীর নীরবতা বিরাজ করছে।

মন্দিরের ভেতরের ছাদ থেকে রংবেরঙের ফালি ফালি কাপড় ঝুলছে। আসলে এগুলি ধর্মীয় পতাকা। পবিত্রতার প্রতীক। কক্ষ জুড়ে ছোট ছোট ডেক্স—প্রার্থনার জন্য। মোমবাতি বা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে—একটা আলো-আঁধারি পরিবেশ। দেওয়ালের গায়ে ভগবান বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনার ছবি। আমরা ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম বেশ কিছুক্ষণ। যিনি ঈশ্বরকে স্বীকার করেননি, কিন্তু ভারতের মানুষ তাঁকেই ঈশ্বরজ্ঞানে অবতার রূপে পূজা করেন। বস্তুত বেদান্তের 'আত্মনাং বিদ্ধি' এবং বুদ্ধদেবের 'আত্মদীপ ভব' মূলে একই সত্যের সন্ধান দেয়।

দর্শন সেরে মন্দিরের সিড়িতে এসে বসলাম। একজন বৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুও সেখানে বসেছিলেন। তাঁকেই প্রণাম করে মনাস্ট্রির বিষয়ে জানতে চাইলাম। তিনি হিন্দিতেই বললেন। আসলে বাকি ভারতের মতো এখানেও হিন্দি 'লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ'। তিব্বত থেকে মেরা লামা ঘোড়ায় চেপে এখানে এসেছিলেন। তিব্বতি ভাষায় ঘোড়াকে 'ত' (TA) বলে। ঘোড়ার পায়ের ছাপ এখানে পড়েছিল বলে জায়গাটার নাম দেওয়া হয় তাওয়াঙ। সেরা লামা মনাস্ট্রির জন্য এই জায়গাটাই নির্বাচন করেন। পরে ধীরে ধীরে মনাস্ট্রি ঘিরে বসতি শুরু হয়। কথায় কথায় এখানকার পাঠাগারটির কথা উঠল। এই পাঠাগারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বহু পুরাতন বই ও পুঁথি রয়েছে এখানে। আমরা পাঠাগারটি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি জানালেন এখন তা বন্ধ। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম। সেটা এখানকার ধ্বজ দণ্ড। বিশাল দীর্ঘ এই দণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকা তোলা হয়। সেই দণ্ডে পতাকা লাগাবার জন্য তখন তোড়জোড় চলছে।

এখান থেকে দেড় কিমি দূরে আরেকটি মনাস্ট্রি রয়েছে। যার নাম গিয়ানচাং আন গুম্ফা। যা মহিলা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লামীদের মঠ নামে পরিচিত। সেখানে যাওয়ার সময় তাওয়াঙের সেই বিশাল বৌদ্ধ মূর্তিটিও দর্শন করলাম। তাওয়াং শহরের মাঝে পাহাড়ের উপর শ্বেতবর্ণের নবনির্মিত (২০.০৬.২০১৯) এক বিশাল ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি। বহু দূর থেকেই যা চোখে পড়বে। এত বিশাল বুদ্ধমূর্তি এর আগে কখনও দেখিনি। বস্তুত এত বিশাল কোনও স্ট্যাচুও এর আগে দেখিনি। পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো পথ পেরিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের মঠে এলাম। যেখানে গাড়ি থামল তার থেকে আরও ভেতরে সেই মঠ। অশোকনজী আর চতুর্বেদীজীর উৎসাহের সীমা নেই। তারা সেই মঠ দেখতে গেল চড়াই ভেঙে। বিজয়ের সঙ্গে গাড়ির কাছেই আমরা রইলাম। বাইরে চড়া রোদ। তবে সুন্দর বাতাস বইছিল। একটা ছায়া দেখে সেখানেই দাঁড়ালাম। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তবে সবুজের খামতি নেই। চারদিকে তাকিয়ে প্রকৃতিকে দেখতে দেখতেই সময় কেটে গেল।

বিকেলের দিকে মার্কেটটা ঘুরে দেখতে বেরোলাম। সাজানো-গোছানো সব দোকান। নানা ধরনের তিব্বতীয় শীত বস্ত্র। ধূপ, বৌদ্ধদের পূজার সামগ্রী, জপ করার যন্ত্র, নানা ধরনের বই, বেশিরভাগই ধর্মীয়। এইসব দেখতে দেখতে একটা দোকানের আলমারিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটা ছোট ছবি দেখলাম। উৎসাহটা বেড়ে গেল। এতদূরে এরকম একটা দোকানে। দোকানিকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, কলকাতায় এসে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবিটা কিনে এনে এখানে রেখেছেন। আর এক কথা। বাজার বলতে ভিড়ের যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠে এখানে তেমনটা নেই। বাজার বলে আলাদা কোনও মনে হয় না। এরই মধ্যে দেখলাম একদল সেনা মার্চ করতে করতে চলে গেল। এখানে যে এরকম প্রায়ই হয়, আশপাশের লোকের ভাবভঙ্গি দেখে তেমনটাই মনে হলো। এখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। তাই হোটেলে ফিরতে হলো।

একটু পরেই আবার ওয়ার মেমোরিয়াল দেখতে বেরোলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্যবীর্যের ইতিহাসকে স্থানে স্থানে সংরক্ষণের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। এই মেমোরিয়ালটি ভারত-চীন যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত সৈনিকদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। রয়েছে যশবন্ত সিংহ রাওয়াতের একটি আবক্ষ মূর্তি। দর্শকদের বসবার জন্য ২০-২৫টি আসন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে ভারত-চীন যুদ্ধের একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। টিকিট ২০ টাকা। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্বের কাহিনি এই তথ্যচিত্রের বিষয়।

তাওয়াঙের আশেপাশে দেখার মতো গোরিচেন পিক আর দুটো লেক আছে। তাওয়াং শহর থেকে প্রায় ৪০ কিমি. দূরে রয়েছে বুমলা পাস। উচ্চতা ১৬ হাজার ফুট। এখানে যাওয়ার জন্য ইনার লাইন পারমিট প্রয়োজন। বেশিরভাগ সময়ই বরফের জন্য রাস্তা বন্ধ থাকে। এখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে আবহাওয়া একটা বড়ো ফ্যাক্টর। রয়েছে অক্সিজেনের অভাব। গাড়ি থেকে নেমে এখানে কিছুটা পথ হেঁটে যেতে হয়। এই বুমলা পাস দিয়েই তিব্বত থেকে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন দলাই লামা। কিন্তু সময়ের অভাবে এসব আর দেখা হয়ে উঠেনি। তবে লাদাখে যাওয়ার পথে জোজি লা পাস দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল। বুমলা পাস না দেখার সেটুকুই যা সান্ত্বনা।

ফেরার পথে পরদিন বমডিলায় পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। এবারে স্থানীয় মনাস্ট্রির গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। এখানকার এটাই বোধ হয় বেস্ট গেস্ট হাউস। সত্যিই সুবন্দোবস্ত। চারদিকেই খোলামেলা। সবুজে মোড়া চারদিকের শোভা দেখতে দেখতে মন ভরে যায়।

পরের দিন বিকেল হয়ে গেল তেজপুরে পৌঁছাতে। চতুর্বেদীজীর আগ্রহে তেজপুরে মনোহর বাগিচাটাও দেখা হয়ে গেল। সেখানে অসুররাজ বাণের কন্যা ঊষা ও দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধর মূর্তি রয়েছে। রয়েছে সখি চিত্রলেখার মূর্তিও। সে সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক কয়েকটি নিদর্শন। ঊষা স্বপ্নে দেখেন দয়িত অনিরুদ্ধকে। সখী চিত্রলেখা স্বপ্নে দেখা রাজকুমার অনিরুদ্ধের রূপ দেয় এক চিত্রে।

চর্তুবেদীজী আমাদের এই ২০৩০ কিমি সড়কপথের সফরসূচিটি এমনভাবে করেছিলেন যাতে দশদিনে শেষ করা যায়। আমাদের সফরসূচিতে এমন দুটো গন্তব্যস্থান ছিল যা অরুণাচলের দুই প্রান্তে। তাওয়াং যদি হয় অরুণাচলের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, তবে পরশুরাম কুণ্ড পূর্ব প্রান্তে।

আবার সেখান থেকে ইটানগরে। আসলে এটা কোনও পরিকল্পিত সফরসূচি নয়। অনেকটা যেমন খুশি তেমন। ফলে পথ হয়েছে দীর্ঘ। কখনও ব্রহ্মপুত্র আমাদের বাম দিকে, তো কখনও ডানদিকে। তিব্বত থেকে আসা পাঁচটি নদী—কামেং, সুবনসিরি, সিয়াং, লোহিত ও দিয়াং অরুণাচল হয়ে অসমে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নাম নিয়েছে।

তেজপুর থেকে সকালে রওনা দিয়ে কাজিরাঙ্গা পৌঁছাতে প্রায় দশটা হয়ে গেল। কাজিরাঙ্গা অসমের একমাত্র জাতীয় উদ্যান। ভারতীয় একশৃঙ্গী গণ্ডারের জন্য কাজিরাঙ্গা বিখ্যাত। জঙ্গল সফরের জন্য বনবিভাগের জিপ আছে। ঘণ্টাদুয়েকের সফর। জঙ্গল কখনও

গভীর—বেশি দূর চোখ যায় না—আটকে যায়। আবার কোথাও বিস্তৃত এলাকা—গাছপালা ততটা ঘন নয়। কোথাও কোথাও জলাভূমি। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মেঠো পথ এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। আমরা একদিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক দিয়ে বেরোলাম। ৩০ কিমি হবে। কোথাও কাছ থেকে কোথাও বা দূর থেকে একশৃঙ্গী গণ্ডার, বুনো মহিষ, বুনো শুয়োর, হাতি আর অগুনতি হরিণ দেখলাম। নানা রকমের পাখি তো রয়েছেই। দূরে এক গণ্ডার চরে বেড়াচ্ছে। অন্যটা শূন্যে দষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। বুনো মহিষের শিং দুটো দেখার মতো— দুটো শিং মিলে যেন একটা বৃত্ত সৃষ্টি করেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যাভারতীর কাজের বিস্তারের ক্ষেত্রে বিজয় প্রথমদিককার কার্যকর্তা হওয়ায় ওর পরিচিতির পরিধি বেশ বড়ো। কাজিরাঙ্গা থেকে সামান্য দূরে বিদ্যাভারতীর শ্রীনিকেতন বিদ্যালয়ে দ্বিপ্রাহরিক স্নান-ভোজনের ব্যবস্থা হলো। পরে বিদ্যালয়ের আচার্য-আচার্যাদের সঙ্গে একটা আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের কার্যক্রমও হলো। ছোটো ছোটো সব ঘটনা, কিন্তু মনে দাগ কেটে যায়।

কাজিরাঙ্গার কাছে শ্রীনিকেতন বিদ্যালয় থেকে ডিব্রুগড়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছি। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। গাড়িতেই ভাতঘুমে চোখটা বুঁজে এসেছে। হঠাৎ এক ধাক্কায় গলা দিয়ে একটা আর্ত চীৎকার বেরিয়ে এল। সামনের সিটে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। চশমাটা চোখ থেকে ছিটকে গেছে। পাশে বসা বিজয় সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে কপালে হাত দিয়ে দেখছে। অশোকন আর চতুর্বেদীজীও আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ভাগ্য ভালো, তেমন জোরাল আঘাত কিছু পাইনি। সামনে একটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে গিয়ে আমাদের গাড়িটা ধাক্কা মারে। গাড়ির গতি তত জোরাল ছিল না, তাই রক্ষে। না হলে কী হতো ভাবতেই ভয় হয়।

এই ঘটনা ঘটলো গোলাহাট জেলার দেড়গাঁওয়ে। দৈব আনুকূল্যে প্রাণটা বাঁচালো বটে, কিন্তু পুলিশের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল না। দেড়গাঁও মিউনিসিপ্যালিটি বিজেপির দখলে। স্থানীয় বিদ্যা ভারতী স্কুলে আচার্যও বিজয়ের পরিচিত। ফোনাফুনির ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে অনেকেই এসে জুটলেন। এলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তরতাজা যুবক। সঙ্ঘের প্রচারক জেনে তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গিতে আমরাই লজ্জা পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে থাকার ব্যবস্থা, ওষুধের ব্যবস্থা তো হলোই, থানা পুলিশের হেফাজত থেকেও খানিকটা রেহাই পাওয়া গেল। প্রথমে একবার থানায় ও পরে স্থানীয় হাসপাতালে পুলিশের গাড়িতে ঘুরে আসতে হলো এই যা। যে লজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সন্ধ্যায় সেখানে স্থানীয় অনেকে দেখা করতে এলেন। দুপুরে যে একটা দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে সেটা প্রায় ভুলে যাওয়ার মতো।

পরের দিন সকালে স্থানীয় বিদ্যা ভারতীর সম্পাদকের বাড়িতে স্বল্পাহারের আমন্ত্রণ। অমায়িক মানুষ। খুবই আন্তরিক। সকালের বেশ কিছুটা সময় তার বাড়ি ও সংলগ্ন বিদ্যালয়ে কাটল। গাড়িটা ইতিমধ্যেই সারানোর ব্যবস্থা হয়েছে। দুপুরের আহারের পর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। গোলাহাট, জোরহাট, শিবসাগর জেলার মোরান পেরিয়ে ডিব্রুগড়ের বিদ্যাভারতী স্কুলে যখন পৌঁছালাম তখন রাত আটটা বেজে গেছে। এখানেই এদিন রাত্রিবাস।

তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি, ডিব্রুগড় থেকে যাত্রা শুরু করলাম। আজ অনেকটা পথ যেতে হবে। গন্তব্য স্থল পরশুরাম কুণ্ড। ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, দুমদুমা, সাদিয়াঘাটে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে পরশুরাম কুণ্ডে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। বহুদিনের আশা পূরণ হলো। পরশুরাম কুণ্ডের কথা বহুবার শুনেছি। আজ চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হলো। আমরা এখন অরুণাচলের লোহিত জেলায়। ব্রহ্মপুত্রের ওপারে অসমকে ফেলে এসেছি। এখানে ব্রহ্মপুত্রের নাম লোহিত। চারপাশের পাহাড় ঘেরা লোহিতের দক্ষিণ তীরে এক বাঁকের মুখে তৈরি হয়েছে এক কুণ্ড। না, এটা কোনও ঘেরা জায়গা নয়। নদী চলার পথেই সৃষ্টি করেছে ৭৫ ফুট লম্বা আর ৩০ ফুট চওড়া এক কুণ্ড। তীব্র গতিতে বইছে স্রোত। সেই নদীর জল স্পর্শ করতে হলে কোয়াটার মাইল পথ সিড়ি ভেঙে নীচে নামতে হবে। বিজয়ের হাঁটুতে ব্যথা। কিছুটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আর এগোতে চাইল না। বলল, তুমি যাও। আমার হাঁটুতে চোট— তাওয়াঙের সেই ব্যথা এখনও আছে। তবে চর্তুবেদীজীকে দেখে মনে সাহস এসেছে। তিনি নীচে নেমে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নদীর তীরে পৌঁছে গেছেন। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার জয়দেবের সঙ্গে পাশের রেলিং ধরে ধরে নীচে নামছি। যারা নীচ থেকে উপরে উঠছেন তারা সাহস দিচ্ছেন। বলছেন— চলিয়ে চলিয়ে। ঘাবড়াইয়ে মত্। জয়দেব কুণ্ডের ভিডিয়ো রেকডিং করছে। ও কিন্তু স্নান করবে না। যার মা-বাবা জীবিত তাদের এই কুণ্ডে স্নান নিষিদ্ধ বলে বিশ্বাস।

কালিকাপুরাণ অনুসারে যৌবন-বিলাসী মার্তিকাবর্ত দেশের রাজা গন্ধর্ব চিত্ররথকে সস্ত্রীক জলবিহার করতে দেখেন ঋষি জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা। তার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। তিনি কামস্পৃহ হয়ে পড়েন। স্ত্রীর এই মানসিক বিকার সহ্য করতে না পেরে ঋষি জমদ্যগ্নি একে একে চারপুত্রকে মাতৃহত্যার আদেশ দেন। চার পুত্রই মাকে হত্যা করতে অস্বীকার করলে জমদগ্নি ওই চারপুত্রকেই পশুপক্ষীর মতো 'জড়বুদ্ধি হও' বলে অভিশাপ দিলেন। সকলের শেষে কনিষ্ঠ পুত্র রাম পিতার আদেশ শিরোধার্য করে কুঠারাঘাতে মাতার শিরশ্ছেদ করেন। তাঁর এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে জমদগ্নি বর দিতে চাইলে রাম মাকে আবার জীবন দান আর সেইসঙ্গে মা'র এই ঘটনা যেন মনে না থাকে তা প্রার্থনা করেন। জমদগ্নি পুত্রের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। কালিকাপুরাণ অনুসারে মা-কে পরশু বা কুঠার দিয়ে হত্যা করে এই কুণ্ডের জলে স্নান করে পরশুরাম পাপমুক্ত হন। সেই থেকে ব্রহ্মপুত্র বা লোহিত নদীর এই স্থানটি পরশুরাম কুণ্ড হিসেবে খ্যাত হয়েছে। যদিও পরশুরাম কুণ্ডের প্রাচীন অংশটি ১৯৫০ সালের ভয়ংকর ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। প্রাচীন এই কুণ্ডস্থলের উপর দিয়ে এখন লোহিতের প্রবল স্রোত বইছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিশাল বিশাল প্রস্তর খণ্ড নদীবক্ষে এমন রহস্যময়ভাবে আকারে পড়ে রয়েছে যে সেখানে পুরানো জায়গাতেই একটি নতুন কুণ্ড তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে পরশুরাম মন্দির। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরশুরামের মর্মর মূর্তি। মাঘী পূর্ণিমাতে এখানে একমাস ধরে মেলা বসে, স্নান করে পুণ্যার্থীর দল। প্রবাদ, একডুবে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। পাপ যায় কিনা জানি না, জয়দেবের হাত ধরে বিক্ষিপ্ত পাথরের নানা খাঁজ ভেঙে ব্রহ্মপুত্রের সেই তীব্র স্রোতের মধ্যে ঠিক স্নান নয়, অর্ধস্নানটা সারলাম। একটা তৃপ্তিবোধ হলো এই যা। এখন আবার রেলিং ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার পালা। ক্লান্ত দেহটাকে কোনও রকমে টেনে টেনে উপরে উঠছি। বিজয় যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে গিয়েই বসে পড়লাম।

চতুর্বেদীজীও বসে পড়েছেন। একটু ধাতস্থ হলে উপরে উঠে পরশুরাম মন্দিরে গেলাম। ভারতের ইতিহাসে একাধারে শস্ত্র ও শাস্ত্রে অধিকারী ঋষি আর আছে কী না জানা নেই। আমাদের পৌরাণিক ইতিহাসে যে সাতজন চিরজীবীর কথা বলা হয়েছে পরশুরাম তাঁদের একজন—'.....কৃপ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে তে চিরজীবন।' ইদানীং কালের হিট সিনেমা 'বাহুবলী' কি পরশুরামের স্মৃতিকে উসকে দেয় না?

বেলা গড়াচ্ছে। লোহিত জেলার সদর শহর তেজু হয়ে পৌঁছালাম রোয়িঙে। VKB মানে বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কন্যাকুমারী) পরিচালিত একটি স্কুলে থাকার ব্যবস্থা। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে। ১০০০-এর মতো ছাত্র-ছাত্রী। সুন্দরম্ মূর্তি এই বিদ্যালয়ের প্রধান। পাশিঘাট পৌঁছাতে বেলা হয়ে গেল। অরুণাচলের পূর্ব সিয়াং জেলার সদর শহর পাশিঘাট এক মনোরম পর্যটন কেন্দ্র। চওড়া পথের পাশে টিলার ঢালে সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর। চারপাশে সবুজে মোড়া পাহাড়। এখানেও বিদ্যাভারতীর একটি স্কুলে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা।

রোয়িং থেকে সকাল সকালই বেরিয়ে পড়লাম। রোয়িং শহরটা বেশ ছিমছাম। চারিপাশে পাহাড় আর সবুজের মধ্যে কয়েকটি রেখায় সাজানো বাংলো টাইপের বাড়িঘর। পাশিঘাটের থেকে ধীমাজীর দিকে চলার পথে পড়ল দিবং নদী। সদিয়া শহরের পশ্চিম ধরে বয়ে চলেছে দিবং ও ডিহং নদী। দুই নদী পরে গিয়ে মিলেছে লোহিতের সঙ্গে। তিব্বত থেকে বয়ে আসছে এই নদী। ভারতের উত্তর-পূর্বে, অরুণাচলেরও পূর্বে এই নদীর নামেই লোহিত জেলা। দিবং, ডিহং ও লোহিত এই ত্রিধারাই ব্রহ্মপুত্র নাম নিয়ে অসমে প্রবেশ করেছে।

দিবঙের তীরে পৌঁছালাম। বিস্তীর্ণ চর। ওপারটা প্রায় ধূসর, আবছা। জল তেমন না থাকলেও নৌকাতেই নদী পেরোতে হবে। কাচের মতো জল। নদীর তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। গাড়ি ও আমরা নৌকায় চেপে মিনিট পনেরোর মধ্যে ওপারে পৌঁছালাম। পৌঁছালাম তো বটে, এখন পার হতে হবে এই বিস্তীর্ণ নদীর চর। পুরোটাই ছোটো-বড়ো পাথরে ভর্তি। তারই উপর দিয়ে হেলতে-দুলতে ঝাঁকানি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! আধঘণ্টারও বেশি সময় লাগল এই চর পেরোতে। তবে বিস্ময়ে সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম নদীর উপর তৈরি বিশাল বিশাল পিলার। এর উপরই তৈরি হবে সেতু যা জুড়ে দেবে অসম ও অরুণাচলকে। প্রায় একশোটার মতো পিলার গুনেছি। শুধু যাতায়াতের জন্য নয়, দেশের নিরাপত্তার রক্ষার স্বার্থেও এই সেতু খুব জরুরি।

ধীমাজীর দিকে যতই এগোচ্ছি, ততই সমভূমির দেখা মিলছে। বিশাল বিশাল বাগান। বাগানে কমলালেবুর গাছ। হলদে হলদে কমলা ঝুলছে। এক বুড়িমাকে দেখলাম এক পেটি কমলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে সঙ্গী চতুর্বেদীজী গাড়িটা থামালেন। সামান্য কথাবার্তার পর চতুর্বেদীজী দাম মিটিয়ে কমলার পেটিটা গাড়িতে তুলে নিলেন। বুড়িমা-র মুখে তখন আনন্দের যে আভাস দেখেছিলাম তা আজও ভুলিনি।

পাশিঘাট থেকে ধীমাজী হয়ে এবার পাচীন মানে ইটানগর। ধীমাজীতে বিজয়ের বন্ধু শ্রীবরার বাড়িতে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ ছিল। আন্তরিক আপ্যায়নে মনটা খুশিতে ভরে গেল। শ্রীবরা স্থানীয় শঙ্করদেব উচ্চ বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের শিক্ষক। বিধানগরের পথে বান্দরদেওয়াতে একবার থামতে হলো। এখান থেকে অরুণাচল রাজ্যের শুরু। তাই ইনার লাইন পারমিট (IPL) দেখাতে হয়। এখান থেকে পাহাড়ি পথে আধ ঘণ্টায় নাহারলগন। অরুণাচলের রাজধানী ইটানগরের পুরানো এলাকার নামই নাহারলগন। এখানে রেলস্টেশান যা বাকি ভারতের সঙ্গে রেলপথে ইটানগরকে যুক্ত করেছে। কলকাতা থেকে ইটানগরের দূরত্ব ১৫০০ কিমি হবে। নতুন ইটানগর আর পুরানো নাহারলগনের ব্যবধান ১০ কিমি-র মতো। অনুচ্চ পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট এক সুন্দর শহর নাহারলগন। শহরের নীচু দিয়ে বয়ে চলেছে অচিন নদী। পাড়ে পাড়ে উপজাতিদের বাস। বাজারহাট, দোকানপাট, শহরের বেশির ভাগ মানুষের বসবাস এখানে। অসমীয়, হিন্দি, ইংরেজি এই তিন ভাষারই চল আছে এখানে। এমনকী বাংলাও অচ্ছুত নয় এখানে। দুই শহরের মধ্যে বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু। বাসে বা গাড়িতে বসেই শহর দেখা হয়ে যায়। টিলার টঙে রাজভবন, সেক্রেটারিয়েট, বৌদ্ধগুম্ফা। নতুন তৈরি জওহর স্টেট মিউজিয়াম আছে, কিন্তু সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ৬ কিমি দূরের গঙ্গা শেখী লেকও দেখা হয়নি।

নাহারলগনের দোনি পোলো (DONYI POLO) বিদ্যানিকেতনে থাকার ব্যবস্থা ছিল। দোনি মানে সূর্য আর পোলো মানে চন্দ্র। এই দুই দেবতার নামে এই স্কুল। বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই স্কুল। একতলায় সারি সারি ঘর। একটা বিষয় লক্ষ্য করছি, স্কুলগুলি সব বিশাল জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু দোতলা কোনও স্কুল চোখে পড়েনি। এই বিদ্যানিকেতনও দোতলা নয়। এখানকার ব্যবস্থাপক সুকুমারনজী কেরলের মানুষ। অশোকন আর সুকুমারনজী সম্পর্কে আত্মীয়। দুজনেই যুবক—টেক-সেভি।

পরের দিন সকালে অরুণাচল বিকাশ পরিষদের 'বালওয়র্ডি' কার্যক্রম দেখতে গেলাম। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা দেশপাণ্ডেজীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বালক-বালিকাদের এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই ধরনের অনুষ্ঠানে যেমন হয়ে থাকে তেমনই সব হলো। লাভের মধ্যে হলো দুটো। এক, পুরানো পরিচিত নিবারণ মাহাতোর সঙ্গে দেখা। তিনি এখানকার কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর কেন্দ্রে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ হয়ে গেল। দ্বিতীয়টি হলো এই বালওয়াড়ি কেন্দ্র যিনি পরিচালনা করেন তিনি একজন দিদি—বঙ্গভাষী। কিন্তু এখানে বহুদিন ধরে রয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে সঙ্ঘের নবনির্মিত কার্যালয়েও ঘুরে এলাম। নিবারণদার ওখানে চা খেতে গেলে বিজয়কে সম্মান জানানোর প্রসঙ্গে একটা উত্তরীয় পাওনা হলো।

বস্তুত অরুণাচল জুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কন্যাকুমারী), কস্তুরবা গান্ধী ফাউন্ডেশন, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিদ্যাভারতীর মতো ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে পরিচালিত সংগঠনগুলির প্রচেষ্টায় শিক্ষা, সেবা, সমরসতা সৃষ্টির কাজগুলির প্রচার প্রসার হয়েছে। চীন সীমান্ত সংলগ্ন এই রাজ্যটির অধিবাসীরা তাই ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এক দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। যেটা কাশ্মীর উপত্যকার ক্ষেত্রে দেখতে পাই না। এই একাত্মতার উপলব্ধিটাই অরুণাচল ঘুরে আসার একটা বড়ো পাওনা। ২০১৬-র ডিসেম্বরের শেষ পনেরো দিনের ভরা শীতে এই বেড়ানোটায় অনেকেই হয়তো সায় দেবেন না। কিন্তু 'উদিত সূর্যের দেশ' ঘুরে মনে হয়েছে সুযোগটা হাতছাড়া না করা ঠিকই হয়েছে। ▯

মালদা নগরের বাঁশবাড়ি শাখার স্বয়ংসেবক সুদীপ্ত (পাপা) দাসের পিতৃদেব সুদাম কুমার দাস গত ১ মে করোনা আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ ও ১ নাতি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি একজন আদর্শ ব্যবসায়ী এবং স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন।

* * * * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী ও স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক তাপস দত্ত গত ২৪ এপ্রিল ৮৪ বছর বয়সে কলকাতার বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলির বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। এছাড়া তিনি বিজ্ঞান ভারতী এবং ভারতী বিদ্যামন্দিরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * * * *

মালদা জেলার সামসী নগরের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক অমূল্য কুমার সরকার গত ১১ জুলাই ৮৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ১ পুত্র , ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটি স্কুলের করণিক হলেও খুব সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। এলাকায় তিনি 'অমূল্য মাস্টার' বলেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। এলাকায় সামাজিক উন্নয়নে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। উল্লেখ্য, রামশিলা পুজোর শোভাযাত্রায় মুসলমান গুন্ডাদের আক্রমণে তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

* * * * *

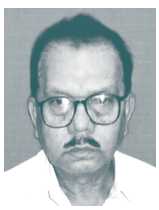

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার সামসী শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুবল চন্দ্র থোকদার গত ১৫ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সামসী এগ্রিল হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। সামসী সরস্বতী শিশুমন্দিরের পরিচালন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সহ সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। এছাড়া স্থানীয় সীতাদেবী বালিকা বিদ্যামন্দিরের পরিচালন সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

* * * * *

কলকাতা মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক বাসুদেব ঝুনঝুনওয়ালা গত ২৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। অকৃতদার বাসুদেবজী তাঁর ভাইপো ও নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সঙ্ঘের স্মৃতিচারণা করে গেছেন। তিনি বহুদিন স্বস্তিকা পত্রিকার ব্যবস্থা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ স্মারক শিলা নির্মাণের সময় একনাথজীর পরামর্শে কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ কেন্দ্রে যোগ দেন। শেষ জীবনে কলকাতায় নিজের বাড়িতে থেকে সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

* * * * *

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রলয় কুমার দাসের মাতৃদেবী সরলা দাস গত ১৯ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। উল্লেখ্য, সরলাদেবীর স্বামী প্রয়াত বদ্রীনারায়ণ দাস মালদা নগরের স্বয়ংসেবকদের কাছে 'মামা' বলে পরিচিত ছিলেন। মালদহে জেলা সঙ্ঘ কার্যালয় ও নেতাজী সুভাষ রোডের সরস্বতী শিশুমন্দির তাঁদেরই দান। তাঁদের পুরো পরিবার সঙ্ঘময়।

* * * * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট নগরের স্বয়ংসেবক চপল কুমার গুহ কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৫ জুলাই বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১কন্যা ও অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। তিনি ৮০-র দশকে একেবারে শুরুর সময় ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। দীর্ঘদিন নিষ্ঠা সহকারে বিজেপি জেলা কার্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার নিষ্ঠা, সেবাভাব, সততা ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে সঙ্ঘ কার্যকর্তারা তাঁকে শাখায় যুক্ত করেন। সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। শাখার মুখ্য শিক্ষক ও পরে নগর সেবা প্রমুখের দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। সেবা প্রমুখের দায়িত্ব ২০১২ সাল অবধি ছিল। এই সময় তাঁর উল্লখযোগ্য কাজ হলো বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের থেকে স্কুল পাঠ্যবই সংগ্রহ করে গরিব ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা।

২০১২ সালে সঙ্ঘের যোজনায় তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদে যোগদান করেন। সেখানে জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে নিজের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতেন। করোনার ভীষণতম পরিস্থিতিতেও দুঃস্থ মানুষদের চাল-ডাল-আলু বিতরণ করেছেন। এরকম একজন মানুষের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

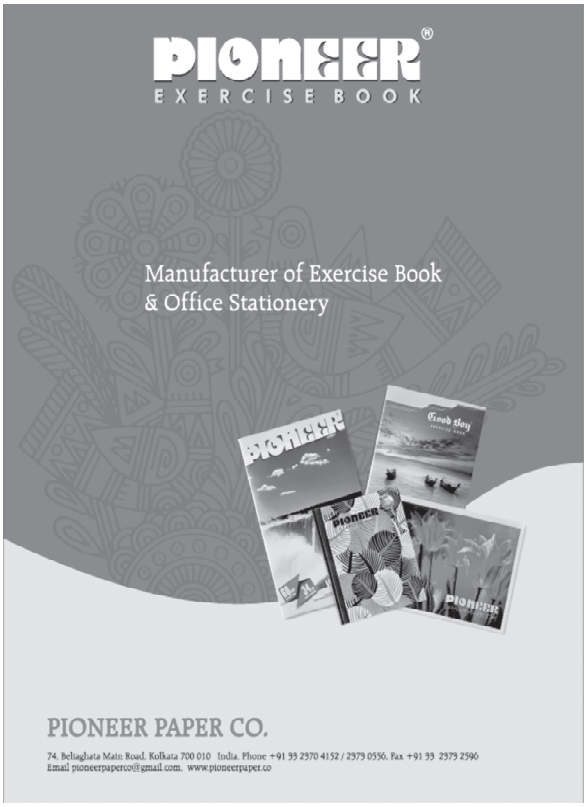

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫